দাম : ষোলো টাকা

আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে এবার বাজেটে প্রতিরক্ষায় গুরুত্ব— পৃঃ ২৬

স্বস্তিকা

মুসলিম লিগের প্রেতাত্মাদের কবর থেকে তুলে এনে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী— পৃঃ ১১

৭৬ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা।। ৫ আগস্ট, ২০২৪।। ২০ শ্রাবণ, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা, ২০ শ্রাবণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

৫ আগস্ট - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

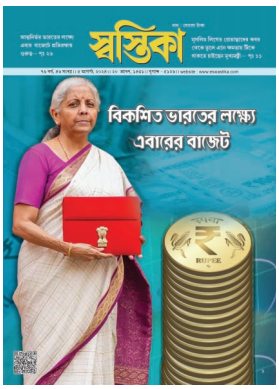

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

ধর্মনিরপেক্ষতার আর্ষপ্রয়োগের বিষ ঢালছেন মমতা?

ধর্মেও আছি জিরাফেও আছি ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

বিবেক বাড়ি আছো? দিদি ডাকছেন ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

বিচার বিভাগের ভাষা হোক ভারতীয় ☐ আশিস রাই ☐ ৮

ভোটব্যাংকের স্বার্থে অনুপ্রবেশের বিপদকেই অস্বীকার ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০

মুসলিম লিগের প্রেতাত্মাদের কবর থেকে তুলে এনে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী ☐ সাধন কুমার পাল ☐ ১১

পশ্চিমবঙ্গকে ইসলামীকরণের জন্য জেহাদি শক্তি সক্রিয় ☐ বিপ্লব বিকাশ ☐ ১৩

বাংলাদেশে অকারণে ভারত বিরোধিতা অনেকটাই পুতুল নাচের মতো মনে হচ্ছে ☐ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী ☐ ১৫

কার্গিলে পাকিস্তানের পাশে ছিল চীন ☐ হীরক কর ☐ ১৭

কেন্দ্রীয় অর্থ বাজেট ২০২৪-'২৫ এবং ভারতীয় রেল ☐ বিমল শঙ্কর নন্দ ☐ ২১

এই বাজেট এবং আমাদের গতিশীল বাজার ☐ শেখর সেনগুপ্ত ☐ ২৩

আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে এবার বাজেটে প্রতিরক্ষায় গুরুত্ব ☐ কর্নেল কুণাল ভট্টাচার্য ☐ ২৪

বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে এবারের বাজেট ☐ ড. পঙ্কজ কুমার রায় ☐ ২৬

২০২৪-'২৫ কেন্দ্রীয় অর্থ বাজেটে পরিকাঠামো উন্নয়নগত ব্যয়বরাদ্দ ☐ সুদীপ্ত গুহ ☐ ২৮

এবারের বাজেটে নারী ক্ষমতায়ন ☐ আনন্দ মোহন দাস ☐ ৩০

হিন্দুধর্মের ত্রিরত্ন—দমন-দান-দয়া ☐ নন্দলাল ভট্টাচার্য ☐ ৩১

গীতা, উপনিষদ ও ভাগবত স্বর্গীয় আনন্দের উৎস ☐ ড. পূর্ণেন্দু শেখর দাস ☐ ৩৪

প্রাচীন বঙ্গের জনপদ ☐ গোপাল চক্রবর্তী ☐ ৩৫

বাংলাদেশে পুলিশ-ছাত্রলিগ খুন করার পরিকল্পনা তারেকের ☐ সাগরিকা মণ্ডল ☐ ৩৮

নিয়মিত বিভাগ :

অঙ্গনা : ১৯ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২০ ☐ অন্যরকম : ৩৯ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮-৫০

প্রকাশিত হবে ১২ আগস্ট, ২০২৪

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে ১২ আগস্ট, ২০২৪

স্বাধীনতা দিবস স্মরণে

স্বাধীনতা দিবস জাতির জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশজুড়ে উদ্‌যাপিত হয় দিনটি। এদিন স্মরণ করা হয় দেশের হুতাত্মাদের। হিসাব করা হয় দেশের অগ্রগতি কতটুকু হলো, দেশের স্ব-তন্ত্র কতটুকু প্রতিষ্ঠিত হলো।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়েই আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

এবারের বাজেটে দেশের স্বার্থ ও জনগণের স্বার্থ উভয়ই সুরক্ষিত

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করিয়াছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। বাজেট লইয়া যেমন অর্থনীতিজ্ঞ মানুষদিগের আগ্রহ থাকে, তেমনই সাধারণ মানুষের ঔৎসুক্যও কিছু কম নহে। সাধারণ মানুষ বাজেটে তাঁদের দৈনন্দিন সমস্যার সুরাহার অনুসন্ধান করেন। আর অর্থনীতিজ্ঞরা দেখেন বাজেটে দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ কতটা মজবুত হইল। ভারতের ন্যায় তৃতীয় বিশ্বের দেশ, যাহার বিপুল জনসংখ্যা এবং যাহার অর্থনৈতিক কাঠামো আরও শক্তপোক্ত হওয়া প্রয়োজন, সেই দেশে জনমোহিনী বাজেট ও আর্থিক সংস্কারের মধ্যে ভেদরেখাটি বরাবরই সুস্পষ্ট। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এই দেশের শাসন ক্ষমতায় যখনই জাতীয়তাবাদী সরকার আসিয়াছে, তখনই তাহারা আর্থিক সংস্কার তথা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো মজবুত করিবার ওপর সদা গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। সে অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকারই হউক, কিংবা নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার— আর্থিক সংস্কারের প্রশ্নে এই দুই আমলেই কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রকের আপোশহীন দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়া নির্বাচন-জয়ের অভিসন্ধি কাজ করে নাই বা কোনোরূপ জনমোহিনী বাজেটের ধারণা প্রশ্রয় পায় নাই।

তবে সাম্প্রতিকতম বাজেটে সাধারণ মানুষের উৎফুল্ল হইবার বিশেষ কারণ ঘটিয়াছে। কারণ কোভিড পরবর্তী পর্যায়ে দুনিয়াব্যাপী আর্থিক মন্দা ও বেকারত্বের মধ্যেও ভারত সরকার 'প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান প্রকল্প'কে আরও অধিকমাত্রায় সচল করিয়া তুলিতে যারপরনাই উদ্যোগী হইয়াছে। এই প্রকল্পে শুধুমাত্র সরকারই ঐকান্তিক উদ্যোগী নহে, তাহাতে দেশের শিল্পমহলকেও শামিল করিবার প্রয়াসের লক্ষ্যে রচিত একাধিক পরিকল্পনার মধ্যে দেশের অত্যন্ত নামি পাঁচশতটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানে আগামী পাঁচ বছরে এক কোটি যুবক-যুবতীকে শিক্ষানবিশি হিসেবে নিয়োগ করিতে সরকারই খরচ জোগাইবার ঘোষণা করিয়াছে। এছাড়া আর্থিক মন্দার বাজারে বিভিন্ন শিল্পে লগ্নিতে দেশের শিল্পমহলকে উৎসাহিত করিবার তাগিদে সরকারের তরফে একাধিক উৎসাহ ভাতার ঘোষণা এবং কর্পোরেট কর ছাড়ের সুবিধা দিয়া শিল্প সংস্থার আর্থিক লাভ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে এই অবকাশে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় দেশীয় অর্থনীতির চক্রকে গতিশীল রাখিবার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহাতে পরোক্ষে কর্মসংস্থানেরও বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। কর-কাঠামোয় কিছু আবশ্যিক রদবদল শিল্পমহলের সহিত সাধারণ মানুষকেও বিনিয়োগে উৎসাহিত করিবে।

শহুরে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিতেও যে সরকারের বিলক্ষণ নজর রহিয়াছে তাহা অনুধাবন করা যায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়নে সরকারের বিপুল বরাদ্দ বৃদ্ধিতে। এই দুই খাতে সরকার বর্তমান অর্থবর্ষে যথাক্রমে প্রায় দুই লক্ষ ছেষট্টি হাজার কোটি টাকা এবং দেড় লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছে। পাশাপাশি স্বরাষ্ট্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বিপুল বরাদ্দ বৃদ্ধি জনগণের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতার প্রকাশ বলে আমাদিগের বিশ্বাস। সময়ের দাবি মানিয়া তথ্যপ্রযুক্তি-টেলিকম ও শক্তিক্ষেত্রে কেন্দ্রের প্রভূত বিনিয়োগও বিশেষ প্রশংসনীয়। কিন্তু আপামর মানুষকে প্রাধান্য দিতে যাইয়া দেশের স্বার্থও উপেক্ষিত হয় নাই। এই বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে সর্বাধিক বরাদ্দ— (ছয় লক্ষ কোটি টাকারও বেশি), তাহাই প্রমাণ করে। পুরাতন ঋণের সুদ সরকারের আর্থিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিলেও এই বাজেট রাজকোষ ঘাটতিতেও রাশ টানিতে সক্ষম হইয়াছে। আশা করা যায়, আগামীদিনে দেশের অধিকতর আর্থিক সমৃদ্ধি হইলে রাজকোষ ঘাটতি অচিরেই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসিবে।

সবমিলিয়ে এবারের বাজেটে যেরূপ জনগণের স্বার্থ সুরক্ষিত হইয়াছে, তদ্রূপ দেশের স্বার্থও উপেক্ষিত থাকে নাই। অন্ধ্রপ্রদেশ ও বিহারের বিশেষ অর্থনৈতিক প্যাকেজ লইয়া বিরোধী রাজনৈতিক দল ও একশ্রেণীর সংবাদমাধ্যম সরব হইয়াছে। এইকথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, তাহাদের এই সরবতার পশ্চাতে অর্থনৈতিক কারণ অপেক্ষা অধিকতর মাত্রায় রাজনৈতিক কারণ লুক্কায়িত রহিয়াছে। তাহারা আশা করিয়া রহিয়াছেন, নীতীশ কুমার কিংবা চন্দ্রবাবু নাইডু কেন্দ্রের উপর ক্রোধে সমর্থন প্রত্যাহার করিয়া লইবেন এবং ইন্ডিজোট সরকার গড়িবে। কল্পনা যত অলীক ও অবাস্তবই হউক না কেন, 'আশায় বাঁচে চাষা' প্রবাদবাক্যকে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছে দেশের প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক জোট। বাজেটে কেন্দ্রের নিকট হইতে বাড়তি সুবিধা আদায় প্রত্যেক রাজ্যেরই লক্ষ্য থাকে। কেন্দ্র-রাজ্যের শাসকদলের রাজনীতি যাহাই হউক না কেন, ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোয় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভাগ্য, চৌত্রিশ বৎসরে রাজ্যের শাসক দল ভোটের স্বার্থে কেবল কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কাঁদুনিই শোনাইয়াছে, রাজ্যবাসীর স্বার্থে কিছু করে নাই। বিগত ত্রয়োদশ বৎসরে সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলিয়াছে। এরাজ্যের বর্তমান শাসক দলকে স্মরণ করিয়া দেওয়া যাক, কেন্দ্রীয় সরকার জনগণের অর্থ উল্লিখিত রাজ্যদ্বয়কে দিয়াছে রাজ্যের উন্নয়নে ব্যয় করিবার জন্য, রাজ্যের শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীদের উদরপূর্তির জন্য নহে।

সুভাষিতম্

ন রাজ্যং ন রাজাসীৎ ন দন্ড্যো ন চ দান্ডিকঃ।
ধর্মৈনৈব প্রজাঃ সর্বা রক্ষতি স্ম পরস্পরম্।। (মহাভারত)

পুরাকালে রাজ্য ছিল না, রাজা ছিল না। দণ্ড ছিল না, দণ্ডদাতা ছিল না। ধর্ম অনুসারেই মানুষ পরস্পরকে রক্ষা করত।

ধর্মনিরপেক্ষতার আর্ষপ্রয়োগের বিষ ঢালছেন মমতা?

ধর্মেও আছি জিরাফেও আছি

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

১৯৬১-তে অ্যালিস্টার ম্যাকলিনের সাড়া জাগানো উপন্যাস 'ফিয়ার ইজ দ্য কি'-র সঙ্গে রাজ্যের পরিস্থিতির অনেক মিল। প্রমাণ তৃণমূলের সন্ত্রাস। সংসদে তৃণমূলের পাঁচ শতাংশ আসন। রাজ্যের পাখি সংসদে আরশোলা। বিজেপি তাই ছিল কিন্তু এখন বাজপাখি। তবে তৃণমূল বাদে স্বাধীনতার পর এই রাজ্যে কোনো দল এককভাবে বিধানসভায় ২০০ আসন পায়নি। ১৯৭২-এ কংগ্রেস ২১৬টি আসন পায় আর চৌত্রিশ বছরের বাম জমানায় সিপিএমের সর্বোচ্চ আসন ১৯০ (১৯৯১)। ২০০১ সালে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি সিপিএম (১৪৩)। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস আর বামেদের গৌণ ভাবেন। প্রধান শত্রু বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেন। শেষ তিনটি বড়ো লড়াইয়ে রাজ্যে ৩৮-৪০ শতাংশ ভোট ধরে রেখেছে বিজেপি। মমতার জোর মুসলমান আর মহিলা ভোট।

নীতি আয়োগ নিয়ে মমতার সাম্প্রতিক নাটক ইন্ডি জোট ভাঙার ইঙ্গিত। বৈঠকে যোগ আর একসঙ্গে বয়কটের মধ্য দিয়ে তৃণমূল নেত্রী বুঝিয়ে দিলেন কংগ্রেস বড়ো দল নয়। কংগ্রেস তিনটি এবং তৃণমূল একটি রাজ্য শাসন করছে। রাজ্যের বাইরে কংগ্রেসের সঙ্গে তার ভাই-ভাই ভাব। তবে রাজ্যে ঠাঁই-ঠাঁই লড়াই তিনি চালিয়ে যাবেন। লোকসভা ভোটকে নিজের ভোট নয় বলে দাবি করেছিলেন মমতা। চরকায় তেল দেওয়া যার স্বভাব সে নিজের ও পরের চরকা মানে না। সর্ববিষয়ে নাক গলিয়ে ভর্ৎসিত হওয়া তার নতুন অভ্যাস নয়। যেমন বাংলাদেশের বিষয়। রাজনৈতিক নেতাদের কান থাকতে নেই। মমতার লক্ষ্য রাজ্যের সমস্ত মুসলমান ভোট কবজা করা, যার ৬-৮ শতাংশ তার হাতের বাইরে।

শহর ও পৌরসভা এলাকায় বিজেপির বাড়বাড়ন্ত তাকে চিন্তায় ফেলেছে। মমতা জানেন ঝুলিতে আসা হিন্দু ভোট দীর্ঘস্থায়ী হবে না। সাতটি নতুন লোকসভা আসন আয়ুহীন বামেদের দান। দু' বছরের ঠেকায় পড়ে মানুষ তৃণমূলকে ভোট দিয়েছে যার সিংহভাগ এসেছে সামাজিক ভীতির মনস্তত্ত্ব বা 'সোশ্যাল ফিয়ার সাইকোসিস' থেকে। হাস্যকরভাবে বিত্ত ছেড়ে মমতা বিবেকের ডাক দিয়েছেন। তৃণমূলের বিবেক যুদ্ধে যাওয়া ঘোড়া। কোনোদিন ফিরবে না। দুর্নীতির পাথরে চাপা থাকবে। মুসলমান ভোট পাওয়ার লক্ষ্যে মমতা বাংলাদেশ বিষয়ে নাক গলিয়েছেন— তা বেআইনি অনুপ্রবেশকারী হোক বা রোহিঙ্গা। মমতার কাছে ভোট বড়ো বালাই। তাই পররাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা জেনেও মমতা নাটক করছেন। আনুমানিক হাজার খানেক ভারতীয় পড়ুয়া (বেশিরভাগ পশ্চিমবঙ্গের বাইরের) বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছেন যেমন ঘটেছিল ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ শুরুর পর।

মমতার রাজনীতি ধরি মাছ না ছুঁই পানি। টাকার দাবি জানাবেন কিন্তু অডিটে পাওয়া বেহিসাবের জবাব দেবেন না। দলীয় চোরদের বাঁচাতে সব ধরনের মামলা করবেন কিন্তু অর্থের দাবি জানাতে মামলা করবেন না।

মমতা তখন আশ্রয় দেওয়া নিয়ে লম্ফঝম্ফ করেননি। কাদের আশ্রয় দিতে চান মমতা? বাংলাদেশি মুসলমান? বিশ্বজুড়ে বাঙ্গালি মুসলমানের সংখ্যা বাঙ্গালি হিন্দুদের চেয়ে বেশি। শতাংশের হিসেবে ৬৭ আর ৩৩। রাজ্যে ১২৮টি আর নিবিড়ভাবে ৬৭ আসন মুসলমান অধ্যুষিত। মমতার ভোট ভাণ্ড। ভাণ্ডে তেল ঢালতে মমতা এক পায়ে খাড়া। গঙ্গা-তিস্তা চুক্তিতে জলাঞ্জলি দিয়ে রাজ্য ভোটের জন্য খুল্লামখুল্লা মুসলমান তোষণে নেমেছেন মমতা। বাংলাদেশ ইসলামিক দেশ। মমতার মুসলমান তোষণের ধাক্কায় এই রাজ্যের হিন্দুরা ভোটে সংখ্যালঘু হয়ে যাবেন। হিন্দু বাঙ্গালির হারিয়ে যাওয়ার দুর্দিন আগত। মমতা নিজেকে ভারতীয় বলে দাবি করেন। তবে ভারতের ধর্ম আর সংস্কৃতিতে হিন্দু আর মুসলমানের যে মর্যাদা রয়েছে তা মানেন না। হিন্দু দেব-দেবীর পূজা করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের শ্লাঘায় সংখ্যালঘু মানুষকে রাজনীতির অংশ হিসেবে দেখেন। মেসির কাছ থেকে বল কাড়া প্রায় দুঃসাধ্য বলেছিলেন ব্রাজিলের জিকো। ধর্মনিরপেক্ষতার আর্ষপ্রয়োগে ভারত ভাবনায় মমতা বারবার তুষ্টিকরণের বিষ ঢালছেন। তাঁকে তা বোঝানো সমান দুঃসাধ্য। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটি সাক্ষাতে বলেছিলেন, 'দিদি কারও কথা শুনবেন না। তিনি যা চাইছেন করতে দিন'। মমতার রাজনীতি ধরি মাছ না ছুঁই পানি। টাকার দাবি জানাবেন কিন্তু অডিটে পাওয়া বেহিসাবের জবাব দেবেন না। দলীয় চোরদের বাঁচাতে সব ধরনের মামলা করবেন কিন্তু অর্থের দাবি জানাতে মামলা করবেন না। দিস্তা কাগজ ঘাড়ে করে দিল্লি নিয়ে যাবেন, শ্বেতপত্র প্রকাশ করবেন না। অনৃতভাষণ যার সঙ্গী রাজ্যের মানুষ তার সে গরল কতদিন পান করবেন সেটাই দেখার। মমতা পাত্র নিদারুণ বিষে ভরা। তাই দূরে ফেলে দাও ত্বরা।

বিবেক বাড়ি আছো ? দিদি ডাকছেন

বিবেকসন্ধানীষু দিদি,

গত সপ্তাহের চিঠিতে আপনার বিবেকের খোঁজ নিয়ে লিখেছি। তার পরেও মনে হলো, কিছু কথা যেন বলা হয়নি। একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে আপনার 'বিত্তবান নয়, বিবেকবান চাই' মন্তব্যটা নিয়ে অনেক ভেবেছি দিদি। তার পরে মনে হলো আরও কিছু কথা আপনাকে জানানো দরকার।

আমি সত্যি করেই ভাবছিলাম একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা শাসক দলের সর্বাধিনায়িকা প্রকাশ্যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে নিজের দলের উদ্দেশে কেন বললেন 'বিত্ত নয়, বিবেক চাই'? তবে কি দিদি আপনি সেই কঠিন সত্যটা উপলব্ধি করেছেন যে, তৃণমূলে এখন বিবেকের পরিবর্তে বিত্তের চাহিদা অতি প্রবল আকার ধারণ করেছে। আর্থিক দুর্নীতি এই রাজ্যে যে ভাবে নিরাবরণ হয়ে গিয়েছে, বেপরোয়া আর্থিক দুরাচার দলের সর্বস্তরে তথা জনজীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে, তখন রাজ্যের শীর্ষনেত্রী হিসেবে আপনার বুঝতে পারাটা সত্যিই সুইঙ্গিত। এই রাজ্যের মানুষও দুর্নীতিকে কোলবালিশ বানিয়ে ঘুমোতে রাজি। সেটা তো গত লোকসভা নির্বাচনেই প্রমাণিত। যত রকমের ব্যাখ্যাই হোক শহুরে মানুষ কিছুটা দূরত্ব বাড়ালেও গ্রামীণবঙ্গ দুর্নীতিকে মেনে নিয়েছে এটা ভোটের ফলে স্পষ্ট। সেটা উত্তরবঙ্গেও।

কারণ, অনেক জায়গাতেই আপনার দল অতীতের তুলনায় বেশি ভোট পেয়েছে। এর পরে আপনার মুখে বিবেকবার্তা পরোক্ষ দুর্নীতি যে চলছে তার স্বীকৃতি। কিন্তু সমস্যা দিদি একটাই। এই বার্তা আপনার মুখে নতুন নয়। আপনি তো থেকে থেকেই সহকর্মী ও অনুগামীদের উদ্দেশে এমন সুভাষিত দিয়ে থাকেন। প্রায়ই প্রকাশ্য সভা থেকে প্রশাসনিক বৈঠকে তর্জনগর্জনও চালিয়ে যান। আপনার ভাষায় একটু আধটু বদল এলেও 'এখন থেকে কোনও অভিযোগ কারও বিরুদ্ধে যেন দল না পায়; যদি পায়, তাহলে কিন্তু আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবো' ধরনের কথা শোনা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, উপযুক্ত ব্যবস্থার ইচ্ছা যদি সত্যিই থাকে, তবে এতদিন তা করেননি কেন? দুর্নীতির সহস্র নিদর্শন তো এই রাজ্যে থরে থরে ছড়ানো আছে। মিড ডে মিলের টাকা চুরি থেকে পুকুর, রাস্তা সবই চুরি যাচ্ছে দিনের পর দিন। সবাই বারোমাস দেখতে দেখতে চোখ সইয়ে নিয়েছেন। আর আপনি মাঝে মাঝে দেখতে পান। হঠাৎ খেয়াল হয় আলুর দাম তো এত হওয়া উচিত নয়। কয়েকদিন বাজার গরম করেন। তার পরে আবার ঘুম।

অভিযুক্তরা বহাল তবিয়তে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ছোটো মাঝারি বড়ো চেয়ার দখল করে বসে আছেন অনেকেই। দিদি, দুর্নীতি তো আপনিও করে চলেছেন। কেন্দ্রীয় প্রকল্প নিয়ে যা যা হয়েছে তাতে আপনার মদত তো স্পষ্ট। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম বদলে রাজ্যের বলে চালিয়ে দেওয়া কি কম বড়ো দুর্নীতি? কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা যাঁদের গ্রেপ্তার করেছে, তাঁদের কি আপনি চিনতেন না। কিন্তু দলের টাকা দরকার। তাই দেদার তোলাবাজি, চুরি, বাটপাড়িকে আপনি প্রশ্রয় দিয়ে গিয়েছেন। সিবিআই, ইডি তৎপর হওয়ার আগে ক'টা ক্ষেত্রে আপনার দল বা সরকারের তরফে অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দেখা গিয়েছে? এমনকী, অভিযুক্তেরা গ্রেপ্তার হওয়ার পরেও আপনার মন্ত্রীসভায় থেকে গিয়েছেন। একজন তো তিহার জেলে বসেই আপনার দলের জেলা সভাপতি। আপনার সরানোর সাহস হয়নি। এই অবস্থায় দিদি, খোলা মঞ্চে দাঁড়িয়ে আপনার চেতাবনির দাম ক'পয়সা? দলের কোনও নেতা কী আদৌ আপনার এই হুঁশিয়ারিতে কান দিয়েছেন? বিবেক বর্জিত বিত্তের সাধনা চলছেই। নিজের ঘরেও কি কোনও বদল আনতে পেরেছেন? আসলে আপনি বদল চান কী?

> "ক্ষমতায় টিকে থাকা যখন নীতি ও নৈতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, নিজেকে কায়েম রাখার সাধনায় নিমজ্জিত হয়, তখন সেই কানাগলি থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর।"

ক্ষমতায় টিকে থাকা যখন নীতি ও নৈতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, নিজেকে কায়েম রাখার সাধনায় নিমজ্জিত হয়, তখন সেই কানাগলি থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। পশ্চিমবঙ্গের দুঃশাসন তারই একটি উদাহরণ। 'লোভ' দমনের পাশাপাশি নেত্রীকে বারবার দলের লোকজনদের সংযত ও বিনীত হওয়ার নির্দেশ ঘোষণা করতে হচ্ছে। এমন নির্দেশ শুনে অনুব্রত মণ্ডল বা শেখ শাজাহানরা মনে মনে কী ভাবছেন দিদি?

দিদি, সুসজ্জিত মঞ্চ থেকে বিবেক চাওয়ার গর্জন চলতে থাকবে, কিন্তু তৃণমূলে শিষ্টের দমন এবং দুষ্টের পালন অব্যাহত থাকবে। কারণ, ওঁরাই আপনার সম্পদ। অপরাধ নেবেন না একটা কথা বলছি বলে। মঞ্চ থেকে বাণী দেওয়ার চেনা গণ্ডী থেকে আপনি কখনও বের হতে পারবেন না। আর আপনার দলও কোনো দিন বিবেকের সাধনা করতে পারবে না। বিত্তের লোভ যে বড়োই মারাত্মক দিদি! □

বিচার বিভাগের ভাষা হোক ভারতীয়

> **সভ্য ও উন্নত দেশের আদালতে সেই দেশের নাগরিকদের ব্যবহৃত ভাষা ও লিপির ব্যবহার হয়ে থাকে। ভারত একমাত্র দেশ যেখানে আদালতে যে ভাষার প্রয়োগ হয়, তা না শাসকের মাতৃভাষা, না দেশবাসীর ব্যবহৃত ভাষা'।**

দেশে সুশাসনের ভিত্তি হলো--- 'ন্যায়বিচার'। এই কারণে ন্যায়বিচার শুধু করলেই হবে না, ন্যায়বিচারকে 'দৃশ্যমান' হতেও দেখতে হবে। ন্যায় পালিকা বা বিচারবিভাগ হতে এই বিষয়টি চির-প্রত্যাশিত হলেও ভারতে তা প্রায় বিরল। কারণ ভারতীয় ন্যায়-প্রণালী বা বিচারবিভাগীয় প্রক্রিয়ায় আজও ব্রিটিশ প্রভাব বিদ্যমান। বিচারালয়ের পোশাক-আশাক, বিচারকদের উদ্দেশে আইনজীবীদের সম্বোধন, শম্বুকগতির বিচারপদ্ধতি, মামলার শুনানিতে দীর্ঘ টালবাহানা থেকে শুরু করে কোনো মামলার রায় বেরোনো পর্যন্ত সব বিষয়ে ইংরেজদের প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়। দেশের সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টগুলিতে শুনানি থেকে শুরু করে মামলায় রায় বেরোনো পর্যন্ত সর্বত্র ইংরেজি ভাষার প্রাধান্য স্পষ্ট। যদিও ভারতে মাত্র তিন শতাংশ লোক ইংরেজি ভাষার জ্ঞানসম্পন্ন। অধিকাংশ মামলার পিটিশন লেখা থেকে হলফনামা-সহ শুনানির সব কাজ ইংরেজিতে হওয়ার দরুন মামলার বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষ বুঝতে পারে না তাদের আবেদনপত্রে কী লেখা রয়েছে, ধরতে পারে না শুনানিতে তাদের পক্ষে বা বিপক্ষে ঠিক কী বলা হচ্ছে। এমতাবস্থায় বিচারপ্রার্থীরা পুরোপুরি তাদের উকিলদের ভরসায় থাকতে বাধ্য হন। ন্যায়বিচার দানের লক্ষ্যে ভারতীয় বিচারবিভাগে অনুসৃত এই ব্রিটিশ রীতি ও রেওয়াজ, বিশেষত সর্বত্র বিদেশি ভাষার ব্যাপক প্রয়োগের, এই নিয়মের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিন ধরেই দেশজুড়ে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে চলেছে।

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি (সিজেআই) ডি.ওয়াই চন্দ্রচূড় লক্ষ্ণৌতে একটি অনুষ্ঠানে বলেন যে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টগুলিতে মামলার শুনানি ইংরেজি ভাষায় হয়ে থাকে। বিভিন্ন বিষয়ে লিগ্যাল আর্গুমেন্ট বা আইনি তর্ক-বিতর্ক আদালতগুলিতে নিরন্তর চলতে থাকে। কিন্তু নানা সময় ঠিক কী বিষয়ে আইনি বাদানুবাদ চললো তা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেন না। এই পরিস্থিতিতে আদালতে হিন্দিতে কথাবার্তা বলা বা বক্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে। এর সঙ্গে আইন সংক্রান্ত পড়াশোনা সহজতর করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যে আইন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের আইন অধ্যয়নের ক্ষেত্রে হিন্দি মাধ্যমে এলএলবি পাঠ্যক্রম চালু করার বিষয়টিতেও তিনি জোর দেন।

সিজেআই বিচারবিভাগের কাজকর্ম পরিচালনার ভাষা কী হওয়া উচিত সেই সংক্রান্ত বক্তব্য যখন রাখছিলেন, সেই সময় এলাহাবাদ হাইকোর্টে নির্দিষ্ট দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে হরতাল চলছিল। দু'দিন ব্যাপী এই হরতাল চলাকালীন অ্যাসোসিয়েশনের দ্বারা এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে আইনজীবীরা এখন থেকে বিচারপতিদের 'মি লর্ড' বা 'ইয়োর লর্ডশিপ' ইত্যাদি সম্বোধন করবেন না, তার পরিবর্তে 'স্যার' সম্বোধন করবেন।

আদালতের পোশাক : ভারতে ব্রিটিশ শাসন স্থাপিত হওয়ার আগে বিচারকদের পোশাক-পরিচ্ছদ স্থানীয় বেশভূষার মতোই ছিল। ১৬২৭ সালে ব্রিটেনের তৎকালীন শাসক তৃতীয় এডওয়ার্ড ব্রিটিশ বিচারকদের জন্য একটি ড্রেস কোড বা পোশাকবিধি চালু করেন। ১৬৩৫ সালে এই ড্রেস কোড সংক্রান্ত নিয়মাবলী তৈরি হয়। এরপর ১৬৮০ সালে বিচারকদের কালো কোট, সাদা ব্যান্ড, গাউন ও উইগ পড়া বাধ্যতামূলক করা হয়। ভারতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন এবং পরবর্তী পর্যায়ে ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের অধীনে ভারত শাসনে বিচারকদের পোশাক-পরিচ্ছদ একই রকম থেকে যায়। এরপর ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলেও, বিচারক ও আইনজীবীদের বেশভূষাগত কোনো পরিবর্তন কিন্তু হয়নি। ১৯৫০-এর দশকের শেষের দিকে পরিধেয় থেকে উইগ অদৃশ্য হলেও বাকি পোশাকগুলি যেমন— কোট, ব্যান্ড ও গাউন পরার চল থেকে যায়।

অ্যাডভোকেট অ্যাক্ট বা অধিবক্তা অধিনিয়ম, ১৯৬১ অনুযায়ী বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার দ্বারা ভারতীয় আইনজীবীদের পরিধান নির্ধারিত হয়ে থাকে। বার কাউন্সিলের

নিয়মানুযায়ী— পুরুষ আইনজীবীদের জন্য কালো কোট, কালো অচকান বা কালো শেরওয়ানি, তার নীচে সাদা শার্ট, গলায় সাদা ব্যান্ড বা কালো টাই, প্যান্ট / ধুতি (জিন্স বাদে), গাউন এবং মহিলা আইনজীবীদের জন্য কোট ব্যান্ড বা কালো টাই ও গাউন ছাড়া শাড়ি-ব্লাউজ, লম্বা স্কার্ট, সালোয়ার-কামিজ আদালতে পরিধেয় হিসেবে নির্ধারিত। পাশ্চাত্য কোট ও গাউনের ব্যবহারের যৌক্তিকতার প্রশ্নে বার কাউন্সিল যদিও কোনো সন্তোষজনক কারণ দর্শাতে পারেনি।

বিচারকদের সম্বোধন : বিচারকদের 'মি লর্ড' বা 'ইয়োর লর্ডশিপ' বলে সম্বোধনের রেওয়াজ ব্রিটিশ জমানায় শুরু হয় এবং এই প্রথা আজও অব্যাহত রয়েছে। যদিও মাঝে মধ্যেই এই কলোনিয়াল হ্যাংওভার নানাভাবে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা চলেছে। কয়েকজন বিচারপতিও আদালতে সম্বোধনের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ আমলের এই প্রথা পরিবর্তনের পক্ষে সমর্থনসূচক বক্তব্য রেখেছেন। 'মি লর্ড' ও 'ইয়োর লর্ডশিপ' জাতীয় সম্বোধনকে ভারতের ঔপনিবেশিক অতীতের শেষচিহ্ন আখ্যা দিয়ে ২০০৬ সালে বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ায় একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়। সেই প্রস্তাব হলো— 'বারের কর্তব্য অনুযায়ী আদালতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং বিচারালয়ের গরিমা অক্ষুণ্ণ রাখতে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট বা উচ্চ-আদালতগুলিতে 'ইয়োর অনার' বা 'মাননীয় আদালত' এবং জেলা-সহ নিম্ন আদালতগুলিতে 'স্যার' বা বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় স্যার-অর্থবোধক কোনো সম্মানসূচক শব্দবন্ধ ব্যবহারের মাধ্যমে সম্বোধন করা উচিত। বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার এই প্রস্তাবকে উল্লেখ করে বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের অনেক বিচারপতি নানা সময়ে তাদের সম্বোধনের ক্ষেত্রে 'মি লর্ড'-এর মতো শব্দবন্ধ প্রয়োগ না করার ব্যাপারে আইনজ্ঞদের বলেও থাকেন।

২০২৩ সালের নভেম্বরে সুপ্রিম কোর্টে শুনানি চলাকালীন একজন আইনজীবীর তরফে বারবার 'মি লর্ড' ও 'লর্ডশিপ' সম্ভাষণের পর বিচারপতি নরসিমহা তাঁকে বলেন— ''আপনি 'মি লর্ড' বলা বন্ধ করলে আমার বেতনের অর্ধেক আপনাকে দিয়ে দেবো।" যদিও ইংরেজ আমলের 'মি লর্ড' বা 'ইয়োর লর্ডশিপ' জাতীয় শব্দবন্ধ বর্তমানে আইনগতভাবে ভারতীয় বিচার পদ্ধতির অংশ নয়।

ইংরেজ গিয়েছে, ইংরেজি নয় : ভারতের বিভিন্ন অংশ যখন বিভিন্ন রাজার রাজত্বের অধীনে ছিল, তখন রাজদরবারে বিচারপর্ব চলতো। বাদী-বিবাদীদের কথ্য ভাষাতেই সেই বিচারপর্ব পরিচালিত হতো। পরবর্তী পর্যায়ে মুঘল শাসনে বিচারবিভাগীয় ভাষার পরিবর্তন ঘটে। মুঘল আমলে সদর দেওয়ানি আদালত ও সদর নিজাম-এ-আদালত তৈরি হয় যেখানে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা-মোকদ্দমার শুনানি ফার্সি ভাষায় পরিচালিত হতো। সেই আমল থেকেই ভারতীয় ভাষাগুলির পরিবর্তে ফার্সি ভাষায় ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হতে থাকে। তারপর ভারতে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত হলে বিচার প্রক্রিয়ায় ইংরেজি ভাষা ব্যবহৃত হতে থাকে। সেই সময় ফার্সি ও ইংরেজি জানা ব্যক্তিরাই আদালতে চাকরির সুযোগ পেতেন। সেই সময় বিচার ব্যবস্থা এই দুই ভাষাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতো।

অধিকাংশ ভারতীয়ের কাছে দুর্বোধ্য এই ভাষায় কথিত ও লিখিত আইনি জাল এবং শম্বুকগতির বিচার-প্রক্রিয়ায় আইন-আদালতের চক্কর কেটে হয়রান সাধারণ ভারতবাসীর ওপর এই শোষণ ব্যবস্থার প্রভাব দেখে ১৮৮২ সালে তৎকালীন শিক্ষা আয়োগ (হান্টার কমিশন)-এ উপস্থিত হয়ে ভারতীয় বিচার বিভাগের ভাষা হিসেবে হিন্দিকে স্বীকৃতি দানের দাবি উত্থাপিত করেছিলেন ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র। সেই কমিশনে তিনি বলেছিলেন— 'হিন্দিতে যদি আদালতের কাজকর্ম পরিচালিত হয়, তবে সমনে কী লেখা রয়েছে তা পড়ে দেওয়ার জন্য দুই বা চার আনা বা যে কোনো আর্জি (আবেদন) লেখানোর জন্য আট আনা বা এক টাকা দেওয়ার প্রশ্ন উঠবে না।

যারা এইগুলি পড়ে দিয়ে থাকেন, তারা তখন সাক্ষ্যদানের উদ্দেশ্যে জারি হওয়া সমনকে--- গ্রেপ্তারির ওয়ারেন্ট বলার সুযোগটাই পাবেন না। সব সভ্য ও উন্নত দেশের আদালতে সেই দেশের নাগরিকদের ব্যবহৃত ভাষা ও লিপির ব্যবহার হয়ে থাকে। ভারত একমাত্র দেশ যেখানে আদালতে যে ভাষার প্রয়োগ হয়, তা না শাসকের মাতৃভাষা, না দেশবাসীর ব্যবহৃত ভাষা'। প্রসঙ্গত, সেই সময় আদালতগুলিতে ফার্সি ভাষা প্রচলিত ছিল। ভাষাগত পরিবর্তনের মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থার সংস্কারের লক্ষ্যে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের তরফে চালানো প্রয়াস সেই যাত্রায় সফল হয়নি।

পরবর্তীকালে মদনমোহন মালব্য এলাহাবাদে (বর্তমানে প্রয়াগরাজ) ওকালতি শুরু করলে বিচারালয়ে ব্যবহৃত ভাষার আঙ্গিকটি তাঁরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইতে অংশগ্রহণকারী ন্যায়বিচারপ্রার্থী সঠিকভাবে তখনই ন্যায়বিচার প্রাপ্ত হয় যখন আদালতে তাঁর মাতৃভাষায় বিচারক রায়দান করেন এবং সেই ভাষাতেই শুনানি চলাকালীন তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত হয়— মদনমোহন মালব্য এহেন মত পোষণ করতেন। এই মত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতীয়দের ন্যায়বিচারপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিনি বড়ো মাপের জন-আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই দাবি আদায়ে স্থানীয় রাজাদের একত্র করে অওধের গভর্নর স্যার এপি ম্যাকডোনেলের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেন। তাঁর নেতৃত্বে হওয়া এই আন্দোলনের পরিণামে ১৯০০ সালের ১৬ এপ্রিল— ফার্সির পাশাপাশি দেবনাগরি হরফে/লিপিতে আদালতের কাজকর্ম চলবে বলে সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আদালতে চাকরিলাভের যোগ্যতা হিসেবে চাকরিপ্রার্থীর হিন্দি জ্ঞান থাকা আবশ্যিক করা হয়। আদালতে কর্মরত কর্মচারীদের হিন্দি ভাষার প্রশিক্ষণ নেওয়ার আদেশও জারি হয়। সেই সময় থেকে উত্তরপ্রদেশ, বিহারের নিম্ন আদালতগুলিতে ফার্সির সঙ্গে হিন্দি ভাষার ব্যবহার শুরু হয়। স্বাধীনতালাভের পর জেলা আদালতগুলিতে আঞ্চলিক ভাষায় কাজকর্ম শুরু হলেও হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে ইংরেজি ভাষার প্রচলন বহাল থাকে।

(লেখক সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী)

ভোটব্যাংকের স্বার্থে অনুপ্রবেশের বিপদকেই অস্বীকার

সংসদে বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবের প্রস্তাব যে বিহারের কিষাণগঞ্জ, আরারিয়া ও কাটিহারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ ও মুর্শিদাবাদ নিয়ে নতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হোক, এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তর রাজনৈতিক জলঘোলা হয়েছে। দুবের বক্তব্যের নির্যাস ছিল, ওই জেলাগুলিতে এতো বেশি পরিমাণ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ হচ্ছে যে, জনবিন্যাস দ্রুত পালটে যাচ্ছে। সংসদে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছেন, 'বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের কারণে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের জনসংখ্যার বিন্যাস বদলে যাচ্ছে। তাই পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের পাঁচটি জেলাকে নিয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করা হোক।' একই সঙ্গে এনআরসি লাগু করারও দাবি জানিয়েছেন বিজেপি সাংসদ। দুবের কথায়, 'তা না হলে হিন্দুদের অস্তিত্বই থাকবে না'। দুবের বক্তব্যে, 'পশ্চিমবঙ্গ ভাগের' ষড়যন্ত্র, 'সাম্প্রদায়িক জিগির' ইত্যাদির ছায়া দেখছেন দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। 'পশ্চিমবঙ্গের বিভাজন' মূলত একটি রাজনৈতিক ও আংশিক প্রশাসনিক বিষয়, যা এই মুহূর্তে কোনোভাবেই কাম্য নয়। কিন্তু নিশিকান্ত দুবের বক্তব্যের বাস্তবতাকে কী অস্বীকার করা যায়? করা যে যায় না, তার প্রমাণ ত্রিপুরার রাজধানী থেকে গ্রেপ্তার হওয়া ২৩ জন অনুপ্রবেশকারী।

ঘটনা হলো, শনিবার রাতে আগরতলা রেল স্টেশন থেকে তেইশ বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে রেল-পুলিশ জিআরপি। এছাড়াও, ওই বাংলাদেশিদের সাহায্য করার জন্য দুজন ভারতীয়কেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত বাংলাদেশিদের কাছে কোনও রকমের নথিপত্র ছিল না। তাদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে জিআরপি।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত বাংলাদেশিরা কাজের সন্ধানে ভারতে এসেছিল। তাদের বয়স ১৯ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। ধৃতেরা সকলেই বাংলাদেশের রাজশাহীর চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বাসিন্দা। অসমের গুয়াহাটি হয়ে তারা অন্য রাজ্যে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। যাত্রার জন্য ট্রেনকেই বেছে নিয়েছিল তারা। আর সেই কাজে ওই দুই ভারতীয় তাদের সাহায্য করছিল। তবে তাদের দেখে সন্দেহ হওয়ায় প্রথমে আটক, পরে বাংলাদেশি বলে জানতে পেরে গ্রেপ্তার করে জিআরপি। ধৃতদের কাছে কোনও নথিপত্র ছিল না। ধৃতদের বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশ ছাড়াও একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

অনুপ্রবেশ-জনিত বাস্তবতার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও। ২০০৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেত্রী থাকাকালে, তাঁর দলের একমাত্র সাংসদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংসদে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এটি এখন পশ্চিমবঙ্গের কাছে অত্যন্ত দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে'। তিনি তখন এও বলেছিলেন যে, ভোটার তালিকায় অনেক বাংলাদেশি নাগরিকের নামও রয়েছে। আর আজ রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় এসে ভোটব্যাংকের স্বার্থে জ্বলন্ত অনুপ্রবেশ-সমস্যাকে মমতা ব্যানার্জি অস্বীকার করছেন, তাই এর মধ্যে রাজ্যভাগের ছায়া দেখছেন।

তিনি এটা বুঝতে পারছেন না বা চাইছেন না, অনুপ্রবেশ যত না রাজনৈতিক ইস্যু, তার থেকে অনেক বেশি দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রশ্ন। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা যথার্থ বলেছেন, 'এটা আমার জন্য রাজনৈতিক ইস্যু নয়। এটা জীবন-মৃত্যুর ব্যাপার।' তাঁর এই বক্তব্যেও বিস্তর জলঘোলা হয়েছে--- 'অনুপ্রবেশে বদলে যাচ্ছে জনবিন্যাস, এটা বড়ো সমস্যা। আমার জন্য খুব বড়ো ইস্যু। এখন অসমে মুসলমান জনসংখ্যা ৪০ শতাংশ। ১৯৫১ সালে অসমের মোট জনসংখ্যার ১২ শতাংশ ছিল মুসলমান। সেটা বাড়তে বাড়তে এখন ৪০ শতাংশ দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে বহু জেলা আমাদের (অর্থাৎ হিন্দুদের) হাতছাড়া হয়েছে। অনুপ্রবেশ ইস্যুতে সরব হয়েছেন এ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অনুপ্রবেশ রোখার জন্য প্রশাসনিক দক্ষতার চেয়েও দরকার রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

প্রসঙ্গত, আগরতলা থেকে প্রায়ই বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। এর আগে, আগরতলা রেল স্টেশনে জিআরপি বেআইনিভাবে ভারত-বাঙ্গলা আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করার অভিযোগে চার বাংলাদেশি মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছিল। জিআরপি জানতে পারে, যে ওই বাংলাদেশি মহিলাদের কয়েকজনের আমেদাবাদে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। আর বাকিদের ট্রেনে পুনে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। তাদের সাহায্য করার জন্য মহম্মদ কাশেম মিঞা নামে এক ভারতীয় নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি তাদের ভারতে অনুপ্রবেশ ও ভ্রমণে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্য করেছিলেন।

উল্লেখ্য, গত কয়েক সপ্তাহে আগরতলা রেলস্টেশন এবং ত্রিপুরার অন্যান্য অংশে একইভাবে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়াও এই স্টেশনটিকে পাচারের করিডোর হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে পুলিশের সন্দেহ। বাংলাদেশের সঙ্গে ত্রিপুরার সীমান্ত ৮৫৬ কিলোমিটার দীর্ঘ। আর এই দীর্ঘ সীমান্তকে বাংলাদেশিরা অনুপ্রবেশের জন্য কাজে লাগাচ্ছে।

বাংলাদেশিরা পরিকল্পনা-মাফিক অনুপ্রবেশ করবেই। ত্রিপুরা, অসমের মতো যে রাজ্যে পুলিশ-প্রশাসন সক্রিয় সে রাজ্যে অনুপ্রবেশকারীদের দমন করা যাচ্ছে, কিন্তু যে রাজ্যের প্রশাসন ভোটব্যাংকের স্বার্থে অনুপ্রবেশকারীদের ব্যাপারে উদাসীন সেই রাজ্য অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের কারণে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার হালত কী হবে, সেটাই দেশের প্রশাসনকে ভাবাচ্ছে। □

মুসলিম লিগের প্রেতাত্মাদের কবর থেকে তুলে এনে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী

সাধন কুমার পাল

এক সময় অবিভক্ত বঙ্গে ক্ষমতাসীন মুসলিম লিগের ছেড়ে যাওয়া সুপ্ত রাজনৈতিক শক্তিই কী তৃণমূলের ক্ষমতার উৎস? মমতা ব্যানার্জি কী যোগেন মণ্ডলের সার্থক উত্তরসূরী? হ্যাঁ এই প্রশ্নগুলো এখন পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনে উঠছে। কারণ পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের নিজস্ব শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখন আর ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ভণ্ডামি নয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় এবং সাংবিধানিক পদে থেকে ফিরহাদ হাকিম সরাসরি মুসলমানদের সংখ্যা বাড়ানোর আহ্বান করেছেন। সেই সংখ্যা বাড়ানোর উপায় বলে দিয়েছেন— তা হচ্ছে অমুসলমানদের ধর্মান্তরিত করে এই কাজটি করতে হবে। আরও বলেছেন যারা মুসলমান হয়ে জন্মায়নি তারা দুর্ভাগা। এ ব্যাপারে তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণকারী মমতা ব্যানার্জি টুঁ শব্দটি উচ্চারণ করার সাহস দেখাননি। শুধু তাই নয়, মমতা ব্যানার্জি হিন্দু সমাজকে বিভ্রান্ত করে এই ভয়ংকর অপশক্তির প্রকৃত রূপ আড়াল করার জন্য মুসলিম লিগের প্রেতাত্মার ধারক বাহক ফিরহাদ হাকিমকে বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ ও মন্দির কমিটির মাথায় বসিয়ে রেখেছেন।

ধর্মনিরপেক্ষতার সবচেয়ে বড়ো প্রবক্তা বামপন্থী ও কংগ্রেসিরাও এই ব্যাপারে একটি বাক্য উচ্চারণ করেনি। কারণ মুসলমান ভোটের একটা ভাগ তাদেরও খুবই প্রয়োজন। একমাত্র বিজেপি ছাড়া কোনো রাজনৈতিক দল এ কথা বলেনি যে ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য সংবিধান পরিপন্থী। এর থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নিজেদের ভোটের দাম কড়ায়গণ্ডায় বুঝে নিতে যথারীতি মাঠে নেমে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজ। মুসলমান সমাজ এজন্যই বলতে হবে কারণ ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্যের বিরোধিতা দুয়েকজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান ছাড়া আর কেউ করেননি।

পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান ভোটব্যাংকের একটা বড়ো অংশ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী এবং রোহিঙ্গা মুসলমান। এদেরকে ভয় দেখিয়ে মুসলমান ভোট ব্যাংককে সংহত করতে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে মমতা ব্যানার্জি তেড়েফুঁড়ে সিএএ-র বিরোধিতায় নেমেছিলেন। ভোটের বাক্স-বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে তৃণমূল কংগ্রেস হাতেনাতে এই প্রয়াসের ফল পেয়েছে।

মুর্শিদাবাদের মানুষ বলছে তৃণমূলের এমএলএ হুমায়ুন কবীর হিন্দুদের কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে, হিন্দু বিরোধী দাঙ্গা করিয়ে, রামনবমীর শোভাযাত্রায় সরাসরি আক্রমণ করে হিন্দুদের বুথে যেতে না দিয়ে তৃণমূলের বহিরাগত প্রার্থী ইউসুফ পাঠানকে জিতিয়েছেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসীর মতো যারা এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি হুমকি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে। এর থেকে কি মনে হয় না মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ভোটে জেতার জন্য পরোক্ষভাবে দাঙ্গা করাচ্ছেন। এর আগে ফিরহাদ হাকিম কলকাতার বিশেষ এলাকাকে মিনি পাকিস্তান বলে উল্লেখ করেছিলেন। চোপড়ার তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল ইসলাম তো চোপড়াকে ইসলামিক দেশ বলে সম্বোধন করলেন। এই সমস্ত ঘটনার একটি ক্ষেত্রেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কাউকে কিছু বলেছেন বা কারও বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিয়েছেন— এরকম নজির নেই।

১৯৫২ সাল থেকে ভারতে যত নির্বাচন হয়েছে তাতে মুসলমান ভোট ছাড়া ক্ষমতায় আসা সম্ভব নয় এটি একটি কঠোর বাস্তব সমীকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্যতিক্রম ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন, যেখানে মুসলমান ভোট ছাড়াই বিজেপি একক গরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হয়েছিল। কিন্তু ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে আবার সেই পুরনো সমীকরণ মাথাচাড়া দিয়েছে। মুসলমান ভোট বিজেপি বিরোধী শিবিরে ভাগাভাগি হচ্ছে না, বিজেপিকে যারা হারাতে পারে সেখানেই কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। সেই সঙ্গে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় হিন্দুদের ভোট দিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এক সময় ছিল নিজেদের দলীয় সমর্থক না হলে তাকে ভোটদানে বাধা দেওয়া হতো কিন্তু এখন শুধুমাত্র হিন্দু হলেই তাকে ভোট দিতে দেওয়া হবে না, পশ্চিমবঙ্গে এখন এটি একটি প্রচলিত রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইতিহাস বলছে, যাদের দুধ কলা দিয়ে পুষেছিলেন সেই কাল সাপের ছোবলে সাধারণ হিন্দুদের মতো ভয়ংকর পরিণতি হয়েছিল যোগেন মণ্ডলদেরও। সময়ে সাবধান না হলে শুধুমাত্র বাঙ্গালি হিন্দুরা নয়, মমতা ব্যানার্জিরাও ভয়ংকর পরিণতির হাত থেকে রক্ষা পাবেন না।

শুধু নির্বাচনের দিন ভোট করানো নয়, নির্বাচনের ফলাফল বের হওয়ার পর যদি দেখা যায় যে মুসলমানরা যাদের পক্ষ নিয়েছে অর্থাৎ সেই তৃণমূল কংগ্রেস যদি ভোট কম পেয়ে থাকে তাহলে হিন্দু এলাকাগুলোতে চালানো হচ্ছে ভয়ংকর নির্যাতন। সরাসরি লুটপাট চালানো, হিন্দু মন্দির

ফঃ ২

অপবিত্র করা, ধর্ষণ করা, খুন করা এগুলো পশ্চিমবঙ্গে এখন স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের পর যেসব এলাকাতে বিজেপি লিড পেয়েছে অথচ বিজেপির কর্মী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সেখানে অত্যাচার চালানো হচ্ছে রামভক্তদের উপর। সরাসরি হুমকি দেওয়া হচ্ছে এই রামভক্তরাই হচ্ছে বিজেপিকে জেতানোর নায়ক। গ্রামেগঞ্জে কোনো বাড়িতে গেরুয়া পতাকা উড়তে দেখলেই তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের জেহাদিরা।

বাংলাদেশের অনেক জায়গাতেই অশান্তির আশঙ্কায় হিন্দুরা ভোট দিতে যান না। ঠিক একই পরিস্থিতি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায়। বিগত কয়েকটি নির্বাচনের প্রবণতা বলছে যেভাবেই হোক হিন্দুদের নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন রাখতে হবে। এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে যাতে হিন্দুরা আর কোনোদিন ভোট দিতে যাওয়ার সাহস না করে। শুধু মুসলমান এলাকাতে নয়, হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাতেও যাঁরা একটু ধর্মকর্ম নিয়ে থাকেন তাদের বুথেই যেতে দেওয়া হচ্ছে না। ধরে নেওয়া হয় একটু ধর্মকর্ম নিয়ে থাকা মানেই এরা সঙ্ঘ ও বিজেপির সমর্থক, সুতরাং এদেরকে যে করেই হোক ঠেকাতে হবে। মুসলিম লিগের প্রেতাত্মাদের জেহাদি ছকে পা দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের হিন্দু হার্মাদরাও এই কাজে সহায়তা করছে। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এখন এটাই ঘটে চলেছে।

এটা শুনতে হয়তো খারাপ লাগবে কিন্তু বাস্তবে তৃণমূল কংগ্রেসের নামে পশ্চিমবঙ্গের অনেক এলাকাতেই মুসলিম লিগের শাসন কায়েম হয়েছে। স্বাধীনতা পূর্ব ভারতে এই বঙ্গ মুসলিম লিগের রাজনীতি দেখেছে। মুসলিম লিগ দীর্ঘ সময় এখানে ক্ষমতাসীন ছিল। হিন্দুদের ভোট দিতে বাধা দিয়ে ভয়ংকর রকম হিংসার পরিবেশ তৈরি করে ক্ষমতায় আসা মুসলিম লিগের চেনা রাজনৈতিক পথ। সেই ভয়ংকর হিংসার পরিণাম কলকাতা ও নোয়াখালি হিন্দু নরসংহারের মতো প্রতিদিন ঘটে যাওয়া শত শত আক্রমণের ঘটনা।

রাজনীতিতে মুসলিম লিগ সফল হয়েছে। মুসলিম লিগের সেই সাফল্যের নজির হিসাবে দেশভাগ, বাঙ্গালি হিন্দুর জীবনের ভয়ংকর বিভীষিকা খুন, ধর্ষণ, লুটপাঠ, অগ্নিসংযোগ, স্বজন হারানো, দেশ হারানোর সেই কালো অধ্যায় রচিত হয়েছিল। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে মুসলিম লিগ নামধারী দল নেই এটা যেমন সত্যি তেমনি এটাও সত্যি, মুসলিম লিগ একসময় এই বঙ্গে যতটা রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করেছিল সেই ক্ষমতা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মুসলমানদের হাতেই রয়ে গেছে। সেই ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েই আজকে পশ্চিমবঙ্গে সেকুলার রাজনীতির ভিত তৈরি হয়েছে যা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মুসলিম লিগের সেই পুরনো অ্যাজেন্ডা যার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বৃহত্তর ইসলামিক দেশ গঠনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সেদিনের রাজনীতিতেও মুসলিম লিগ একা ছিল না। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের মতো হিন্দুকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়েছিল যাতে বৃহত্তর হিন্দু সমাজকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল করা যায়। সেদিনের হিন্দু সমাজও যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেশভাগজনিত ভয়ংকর পরিণতির কথা কল্পনা করতে পারেনি।

আজকের মমতা ব্যানার্জির মতো সেদিন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলও মুসলিম লিগের হায়নাদের আস্কারায় নানান ছলচাতুরি করে হিন্দু সমাজকে বিভ্রান্ত করতেন, ওদের আসল রূপ আড়াল করতেন। দেশভাগের পর ওদের লক্ষ্য পূরণ হয়ে গেলে যোগেন মণ্ডলকে ছুঁড়ে ফেলতে ওদের এক মুহূর্ত সময় লাগেনি। আজকের দিনেও সেই একই চিত্রনাট্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, যেখানে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের সার্থক উত্তরসূরি মমতা ব্যানার্জির মতো নেত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে সেই ভয়ংকর ভবিষ্যতের কথা কল্পনা করতে পারছে না পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান হিন্দু সমাজ। ক্ষমতার শীর্ষে হয়তো হিন্দু নামধারী কেউ বসে আছে কিন্তু আসলে বকলমে চলছে মুসলিম লিগের সেই ভয়ংকর শাসন। এর সবচেয়ে টাটকা উদাহরণ হলো মহরম নিয়ে মমতা ব্যানার্জির প্রশাসনিক নির্দেশ মুসলমানরা সর্বত্র অমান্য করেছে। মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন মহরমের তাজিয়া রাস্তার এক পাশ দিয়ে করিডোর তৈরি করে বের করতে হবে যাতে সাধারণ মানুষের কোনো সমস্যা না হয়। কিন্তু ঘটেছে তার বিপরীত। যেখানে মহরমের তাজিয়া বেরিয়েছে সেখানটাই মুসলমানরা সমস্ত রাস্তা ব্লক করে তাদের শক্তি প্রদর্শন করেছে। প্রশাসন ছিল নীরব দর্শক। কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন শহরে হকার উচ্ছেদ অভিযান চালালেও কোনো মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় এই অভিযান চালানোর ক্ষমতা মমতা প্রশাসনের হয়নি।

মুসলিম লিগের কাছে ভারত বিভাজন ছিল একটি অসমাপ্ত প্রকল্প। সেই প্রকল্প রূপায়ণের কৌশলের নাম 'ব্লিড ইন্ডিয়া উইথ আ থাউজেন্ড কাটস।' তার ফল আমরা দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গের আনাচে-কানাচে। পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গায় হিন্দুরা পূজাপার্বণ করতে পারেন না, গণতন্ত্রের বৃহত্তম অনুষ্ঠান নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। মহরমের নামে মুসলমানরা খোলা অস্ত্র নিয়ে আস্ফালন করলেও প্রশাসন চোখ বন্ধ করে থাকে। কিন্তু হিন্দুরা ধর্মীয় কারণে কোনো অস্ত্র বের করলে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং তাদের মামলায় জড়িয়ে দেন। তৃণমূল কংগ্রেসের হিন্দু নেতা-নেত্রীরা হয়তো ভাবছেন এই বক্তব্য কি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? স্বাধীনতা-পূর্ব সময়েও যোগেন মণ্ডলের অনুগামীরা মুসলিম লিগের সঙ্গে মিলেমিশে রাজনীতি করেছেন। সেদিনের সেই হিন্দুরাও আজকের মতো রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করে নিজেদের বিজয়ী ভাবতেন, ঠিক যেমন আজকে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা ভাবছেন।

দেশভাগ একদিনে হয়নি। ৫০ বছর আগে থেকেই ধীরে ধীরে জনসংখ্যার পরিবর্তন করা হয়েছে, সংস্কৃতির পরিবর্তন আনা হয়েছে, রাজনৈতিক অধিকার কায়েম করা হয়েছে, তারপর দেশ ভাগ হয়েছে। কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতি একদিনে হয়নি, এটাও বিগত ৫০ বছর ধরে অল্প অল্প করে প্রয়াস করে বর্তমান অবস্থা তৈরি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার পরিবর্তন সেই একই সর্বনাশের ইঙ্গিত দেয়। ১০ বছর পরপর জনগণনা রেকর্ড পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান জনসংখ্যার উদ্বেগজনক বৃদ্ধির হার চমকে দেওয়ার মতো। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যা ১৯৫১ সালে ১৯.৮৫ শতাংশ, ১৯৬১ সালে ২০.০০ শতাংশ, ১৯৭১ সালে ২০.৪৬ শতাংশ, ১৯৮১ সালে ২১.৫১ শতাংশ, ১৯৯১ সালে ২৩.৬ শতাংশ, ২০০১ সালে ২৫.২৫ শতাংশ, ২০১১ সালে ২৭.০১ শতাংশ এবং ২০২১ সালে ৩০.০০ শতাংশ। সেকুলার রাজনীতির পোষ্য কালসাপ এখন ছোবল মারতে উদ্যত হয়েছে। ইতিহাস বলছে, যাদের দুধ কলা দিয়ে পুষেছিলেন সেই কাল সাপের ছোবলে সাধারণ হিন্দুদের মতো ভয়ংকর পরিণতি হয়েছিল যোগেন মণ্ডলদেরও। সময়ে সাবধান না হলে শুধুমাত্র বাঙ্গালি হিন্দুরা নয়, মমতা ব্যানার্জিরাও ভয়ংকর পরিণতির হাত থেকে রক্ষা পাবেন না। □

পশ্চিমবঙ্গকে ইসলামীকরণের জন্য জেহাদি শক্তি সক্রিয়

বিপ্লব বিকাশ

আজকাল উত্তরপ্রদেশে কাঁওড় যাত্রার পথে অবস্থিত রেস্তোরাঁগুলির মালিক ও কর্মচারীদের নাম লেখার বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে অনেক বিতর্ক হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গেও কলকাতার মেয়র এবং তৃণমূল সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন যে যারা ইসলামে জন্মগ্রহণ করেনি তারা দুর্ভাগ্যবান। আমাদের তাদের ইসলামে আনতে হবে, এতে আল্লাহ খুশি হবেন, এই বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে। এর প্রতিবাদে ৩ জুলাই হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি তাদের প্রতিবাদ শুরু করেছে। বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য এই বিষয়ে 'সুয়োমটো' মামলা করে ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে মত দিয়েছেন। মানুষের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে যে তাহলে মমতা ব্যানার্জিরও কি দুর্ভাগ্য যে তিনি ইসলামে জন্ম নেননি? ফিরহাদ হাকিম ২০১৬ সালে তারকেশ্বর মন্দির কমিটির প্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন। তখনও অনেক বিতর্ক হয়েছিল। ২০১৯ সালে তিনি এই পদ থেকে পদত্যাগ করেন। পশ্চিমবঙ্গে কোনো মসজিদ বা গির্জা কমিটির প্রধান কোনো হিন্দু আছেন কি? ফিরহাদ হাকিমের প্রচলিত নাম ববি। ববি হাকিম বিতর্কিত বক্তব্য নিয়ে প্রায়শই চর্চার কেন্দ্রে থাকেন। ৩০ এপ্রিল ২০১৬ সালের ইন্ডিয়া টুডে অনুসারে 'পাকিস্তানের প্রধান সংবাদপত্র ডন-এ সাক্ষাৎকারে তিনি খিদিরপুর অঞ্চলকে 'মিনি পাকিস্তান' বলে অভিহিত করেন।' মালিহা এই সফরের পরে ডন-এ ২৯ এপ্রিল ২০১৬-এ 'ক্যানভাসিং ইন মিনি পাকিস্তান অব কলকাতা' নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। এই প্রতিবেদনে তিনি গার্ডেনরিচ এলাকায় যা

> "ভারত বিরোধী সমস্ত শক্তি তাদের নিজস্ব তন্ত্র বিকশিত করেছে। এই সমন্বয় থেকে তৈরি তন্ত্র একে অপরের অপরাধ গোপন করে এবং ষড়যন্ত্রে সহযোগিতা করার জন্য সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।"

দেখেছেন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে একটি জায়গায় লিখেছেন যে ফিরহাদ সঠিক বলেছেন— এটি মিনি পাকিস্তানের মতো দেখায়।

এবার মুর্শিদাবাদ থেকে পাঁচবারের সংসদ সদস্য এবং কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী তৃণমূলের প্রার্থী গুজরাটের ইউসুফ পাঠান, দিদির ভাষায় বহিরাগত, তার কাছে লোকসভা নির্বাচনে হেরে গেছেন। কেন? ইউসুফ পাঠান কি এই এলাকায় অধীরের চেয়ে বেশি কাজ করেছেন, না তিনি অধীরের চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ? ইউসুফ কি এলাকাবাসীর সমস্যার সম্পর্কে চৌধুরী বাবুর থেকে বেশি জানেন, না এনার কাছে তার সমাধানের পরিকল্পনা রয়েছে? কিন্তু যা তার পক্ষে কাজ করেছে তা হলো মুর্শিদাবাদে ৬৬ শতাংশেরও বেশি মুসলমান জনসংখ্যা। মুসলমান ভোটাররা উন্নয়ন বা আলু, টমাটো, পেঁয়াজ বা পেট্রোলের দামের ওপর ভোট দেয় না। ১৯৪৬ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ভোটিং প্যাটার্ন দেখলে এটি স্পষ্ট হয়ে যাবে। মুসলমান ভোটাররা একজন মুসলমান প্রার্থী এবং মুসলমানদের যে দুধেল গোরু হিসেবে মানে সেই তৃণমূল কংগ্রেসকে দেখেছে এবং তাকে জিতিয়েছে। অর্থাৎ 'আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাই আমাদের শাসন'। এমন শাসনের দিনগুলি কেমন হতে পারে তা ইন্ডিয়া টুডে-র ২ মে ২০২৪-এর

একটি খবর থেকে অনুধাবন করা যাবে। 'তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক হুমায়ুন কবির যখন হিন্দুদের দু' ঘণ্টার মধ্যে ভাগীরথীতে ফেলে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদে হিন্দু ও মুসলমানের জনসংখ্যার বিষয়টিও উত্থাপন করেছিলেন।' মুর্শিদাবাদে মাত্র ২৮ শতাংশ হিন্দু। তাহলে বাকিরা কোথায় গেল?

সবচেয়ে বেশি চিন্তার বিষয় হলো মমতা ব্যানার্জি বাংলাদেশে চাকরিতে সংরক্ষণ নিয়ে ঘটিত হিংসার কারণে পালিয়ে আসা লোকদের পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় দেওয়ার কথা ২১ জুলাই তার দলের প্রকাশ্য সমাবেশে বলেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী কি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের দিয়ে

রোহিঙ্গাদের বিতাড়নের দাবিতে বিজেপির বিক্ষোভ সমাবেশ। (ফাইল চিত্র)

পশ্চিমবঙ্গকে আরও বেশি সমস্যায় ফেলে এবং হিংসার আগুনে ঠেলে দেওয়ার পথে আরও এগিয়ে যাচ্ছেন? তিনি কি অনুপ্রবেশকারীদের শরণার্থী পরিচয় দিয়ে স্থানীয় সমাজের বিদ্যমান সমস্যাগুলিকে আরও বাড়িয়ে দেওয়ার পদক্ষেপ নিচ্ছেন? পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাঙ্গালি সমাজ নির্বাচনকালীন এবং ভোট পরবর্তী হিংসা, সালিশি সভার বর্বরতা এবং বিপক্ষ দলের হওয়ার কারণে অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রাণ বাঁচাতে অন্য রাজ্যে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। জীবিকা নির্বাহের জন্য শ্রমিকদের একটি বড়ো অংশ এই রাজ্য থেকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যেতে বাধ্য হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়গুলিতে কার্যকরী পদক্ষেপ না নিয়ে অনুপ্রবেশকে শরণার্থী নামে অভিহিত করছেন। এ নিয়ে বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ বলেছেন যে মমতা ব্যানার্জি পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশে পরিণত করার চক্রান্ত করছেন।

এদিকে রাজ্যের মন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র বলছেন যে অমুসলমানদের ইসলামে আনলে আল্লা খুশি হবেন। আর মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলায় বিধায়ক সংখ্যালঘু হিন্দুদের ভাগীরথীতে ফেলে দেওয়ার কথা প্রকাশ্যে বলছেন এবং এই হুমকির পর কোনো দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশন একটি নোটিশ দেয়! বামপন্থী সাংবাদিকরা মিডিয়াতে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত স্টুডিয়োতে বসে জিজ্ঞাসা করেন যে 'মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে কী হবে?' এই প্রশ্নের উত্তর নোয়াখালির কাছে আছে, এই প্রশ্নের উত্তর মালদা, মুর্শিদাবাদ, কিষানগঞ্জের কাছে আছে। দেশবাসী কাশ্মীর ভুলেনি যা কয়েক দশক ধরে আলোচনায় রয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। কাশ্মীর এখন শান্ত। কিন্তু দেশে অনেক 'মিনি পাকিস্তান' গড়ে উঠেছে, এগুলি নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা হচ্ছে না। ধীরে ধীরে এমন গ্রাম, ব্লক ও জেলা গড়ে উঠছে যা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ, ফলে ওইসব এলাকা হিন্দুশূন্য হয়ে যাচ্ছে! কিন্তু রাজনীতিবিদদের এ নিয়ে কথা বলার সাহস হয় না। আজকের দিনে পশ্চিমবঙ্গে কোনো দল কি বাংলাদেশের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে? কিন্তু যদি ভারতে এই ভাবেই 'মিনি পাকিস্তান' গড়ে ওঠে সব দলকে বাধ্য হয়ে, মুসলমান প্রার্থী দিতে হয়, তাহলে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী কতদিন থাকতে পারবেন? প্রথমে মন্ত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি দাবি করবে, পরে উপমুখ্যমন্ত্রী এবং তারপর?

এই বিষয়ে পরিকল্পিতভাবে ভারত এবং হিন্দু বিরোধী শক্তি কাজ করছে। আজ কোনো মুসলমান কোনো হিন্দু মেয়েকে লাভ জিহাদের কবলে ফেললে সে তার সমাজের সবাইকে সহযোগী হিসেবে পায়। আইনজীবী প্রস্তুত, নথিপত্র প্রস্তুতকারী প্রস্তুত! কেন? লাভ জিহাদের জন্য কি এরা ফান্ডিং করছে এবং আইনি সহায়তা দিচ্ছে? তার থাকার, খাওয়া ও উপার্জনের ব্যবস্থা কেন হয়েছে? বিভিন্ন সমাজের মেয়েদের প্রলুব্ধ করা এবং বিয়ে করার জন্য আলাদা আলাদা পুরস্কার কেন নির্ধারণ করা হয়েছে? এই ষড়যন্ত্রের অনুমতি কী ভারতের আইন দেয়? ১০ ডিসেম্বর ২০০৯-এ ইকোনমিক টাইমস একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে, 'কেরালা হাইকোর্ট সরকারকে লাভ জিহাদ বন্ধ করার জন্য আইন তৈরির পরামর্শ দিয়েছে'।

গ্রামগুলোতে জোরপূর্বক জমি, পুকুর, বাড়ি ও দোকান দখল করা বা কলকাতায় প্লট দখল বা ফ্ল্যাট কেনা হোক না কেন, সর্বত্র অর্থবল, বাহুবল ও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ— এই মনস্তাত্ত্বিক অস্ত্র হিন্দুদের উপর ব্যবহার করা হচ্ছে। পুলিশ-প্রশাসন শাসকের দলদাসে পরিণত হয়ে গেছে। আদালতে বলবে কে? প্রমাণিত হবে কীভাবে? সন্দেশখালির ঘটনায় এই ইকোসিস্টেমের শক্তি দেখা গেছে, রাজ্য সরকার অপরাধীকে বাঁচাতে সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছে গেছে। জেহাদি শক্তি বাড়বাড়ন্ত শুধুমাত্র মমতা ব্যানার্জি সরকারের সময় তৈরি ও শক্তিশালী হয়েছে তা নয়, বামপন্থী শাসনামল থেকেই এই তন্ত্র কার্যকরী।

কাশ্মীর ফাইলস চলচ্চিত্রের এই ডায়ালগ যে 'সরকার যে কোনো হোক না কেন, কিন্তু সিস্টেম তো আমাদের' এটিকে শুধুমাত্র বামপন্থী অ্যাজেন্ডা হিসেবে দেখলে হবে না। ভারত বিরোধী সমস্ত শক্তি তাদের নিজস্ব তন্ত্র বিকশিত করেছে। এই সমন্বয় থেকে তৈরি তন্ত্র একে অপরের অপরাধ গোপন করে এবং ষড়যন্ত্রে সহযোগিতা করার জন্য সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

কাশ্মীর ও কেরালার তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি বেশি চিন্তাজনক। এই তন্ত্রের ষড়যন্ত্রগুলি প্রকৃতপক্ষে বুঝতে বিশেষ করে তাদের কাজের প্যাটার্ন বুঝতে হবে। এজন্য মানুষকে সচেতন করতে হবে। এই সমস্যা কোনো নির্দিষ্ট দলের পক্ষে বা বিপক্ষে নয়, বরং ভারত ও হিন্দু সমাজের স্বার্থে বুঝতে হবে। ভারত বিভাগের আগে থেকে পশ্চিমবঙ্গকে ইসলামীকরণ করার চক্রান্ত চলছে। কাশ্মীরের হিন্দুদের মতো পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদেরও কি পালাতে হবে, নাকি সময়ের প্রয়োজন বুঝে এর বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন এবং সংগঠিত করার কাজ শুরু করতে হবে? □

বাংলাদেশে অকারণে ভারত বিরোধিতা অনেকটাই পুতুল নাচের মতো মনে হচ্ছে

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

হঠাৎ করেই বাংলাদেশে পুতুল নাচের মাত্রাতিরিক্ততা পরিলক্ষিত হলো। অবস্থাটা দেখে মনে পড়ে গেল পল্লীগীতির সম্রাট বলে পরিচিত আব্দুল আলিমের বিখ্যাত সেই কালজয়ী গানের কথা 'এই যে দুনিয়া কীসের লাগিয়া, এত যত্নে গড়াইয়াছেন সাঁই'। শিল্পী গানের ছলে বুঝাতে চেয়েছিলেন মানুষকে তৈরি করার পেছনে সৃষ্টিকর্তার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। মানুষকে মনুষ্যত্ব দিয়ে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে মানুষ আর মানুষ রইলো না। মানুষ হয়ে গেছে কলের পুতুলের মতো।

শিক্ষিত কী অশিক্ষিত তাদের ইচ্ছে মতো নাচানো কঠিন কাজ নয়। শুধু ভারতের বিরোধিতা করাতে পারলেই বাকিটা পুতুল নিজেই সম্পন্ন করে নেবে। পুতুলের হাতে-পায়ে সুতো বাঁধা থাকে। শুধু কলাকৌশল করে সুতো টানলেই চলে। এ সুতো ও লাটাই যাদের হাতে তারাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল, এখনো আছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, স্বাধীনতার সংগ্রামে ভারতের সহযোগিতাটাই ছিল ভুল। পূর্ব পাকিস্তান থাকাকালীন প্রতিটা বিপর্যয়ে ভারত উদারভাবে হাত প্রশস্ত করেছিল। পরবর্তীতে স্বাধীনতার সংগ্রাম কিংবা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারতের আন্তরিক সহযোগিতা ছিল একান্তভাবে অবধারিত। আসলে দাসত্ববৃত্তি যাদের মস্তিষ্কে শেকড় গেড়েছে তারা বরাবরই দাসত্ববৃত্তিকে ভালোবাসে। বাংলাদেশে দাসত্ববৃত্তিকে ভালোবাসে এমন মানুষের সংখ্যা বেশি।

তাই তারা স্বাধীনতাকে মন থেকে সমর্থন করতে পারেনি। প্রতিবেশী ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে ভারত উদারভাবে সমস্ত সমর্থন জুগিয়েছিল। প্রাণ রক্ষার জন্য যারা দেশ ত্যাগ করেছিল তাদের প্রত্যেককে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা-সহ যাবতীয় চাহিদা পূরণ করেছিল ভারত। এমন মহানুভব ও মানবিক সহযোগিতা ভারতের জন্য কি ভুল ছিল? দেশটিতে আভ্যন্তরীণ কিংবা আন্তর্জাতিক কোনো ইস্যু তৈরি হলেই ভারতকে গালিগালাজ করা বাংলাদেশের একটা সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ যেন সে দেশের অধিক সংখ্যক মানুষের মজ্জাগত স্বভাব। এ স্বভাবটা কারণে-অকারণে মাথা কিংবা শরীর চুলকানোর মতো। ভারতকে গালি দিতে পারলেই তারা তৃপ্ত থাকে। যারা স্বাধীনতার বিপক্ষে কাজ করে ত্রিশ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে, নারীর ইজ্জত লুণ্ঠন করেছে, সম্পদ হরণ করেছে, একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষদের ধর্মের ভিত্তিতে কুঠারাঘাত করেছে, তারাই আজকে স্বমহিমায় অবতীর্ণ। এক্ষেত্রে দোসরদের নাম বলে দেওয়া অত্যুক্ত হবে না। যে সকল দেশ মানুষের হত্যা করতে অস্ত্রের জোগান দিয়েছিল, তারাই তাদের পরম বন্ধু।

ইতিহাস তার সবচেয়ে বড়ো সাক্ষী। চীন ও আমেরিকার কথা ইতিহাসের পাতা থেকে এখনো মুছে যায়নি। মুছে দেওয়ার চেষ্টা করা হলেও রক্তে লেখা সেই ইতিহাস কোনোদিন মুছে যাবে না। পাকিস্তানি

সেনাবাহিনী জল্লাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। আর তাদের দোসর ছিল দেশ বিরোধী রাজাকার বাহিনী। সেই রাজাকারেরা আজকে সংখ্যাধিক্য হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামকে কলঙ্কিত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইস্যু তৈরি করে তাদের দোসরদের সন্তুষ্ট করার জন্য কুটকৌশল চালাচালি করে।

স্বাধীনতার সংগ্রাম চলাকালীন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সারা বিশ্বে জনমত তৈরি করার জন্য নিরলস চেষ্টা করে সফল হয়েছিলেন। আজকে বেইমানরা সেই অবদানের কথা ভুলে যেতে চাইছে। বর্তমান আওয়ামি লিগ সরকারের সাফাই গাওয়া নয়, তারাও দোষ ত্রুটির উর্ধ্বে নয়। আভ্যন্তরীণ দোষ ত্রুটি সংশোধনের জন্য দেশটির প্রশাসনিক ব্যবস্থাই যথেষ্ট। ঘোর আপত্তি শুধু একটি জায়গাতেই, কিছু হলেই কেন ভারত বিরোধিতা? বাংলাদেশে বর্তমান ক্রাইসিস হলো চাকরিতে কোটা বিলোপ করার জন্য আন্দোলন। এই আন্দোলনকে ঘিরে আন্দোলনকারীরা কেন যে ভারতের বিরুদ্ধে অহেতুক অপ্রয়োজনীয় ও অশ্লীল স্লোগান দিচ্ছে তা কোনো শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের কাছে বোধগম্য হতে পারে না। এইসব স্লোগান প্রমাণ করে যে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর লোকের সংস্কৃতি হলো অপ্রয়োজনে অযৌক্তিকভাবে ভারতের বিরোধিতা করা।

বাংলাদেশে যে কোনো আন্দোলনেই পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষভাবে হিন্দু জনগোষ্ঠীকে টার্গেট করা হয়। বর্তমান কোটা বিরোধী আন্দোলনেও কিছু তথাকথিত ইন্টেলেকচুয়াল তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এটা খুব দুঃখজনক। এর ফলে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির কারণে বিভেদ সৃষ্টি হতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে এবং আগে সংঘটিত অনেক রাজনৈতিক ঘটনার ইতিহাসে বরাবরই ভারতের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করার জন্য একটি মহল তৎপর থাকে। ভারত দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব নষ্ট হয় এমন কোনো ভূমিকায় কখনো অবতীর্ণ হয়নি। ভারত বরাবরই সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে চলেছে। উপকৃত হয়ে উপকার স্বীকার না করা কিংবা উপকার করাকে দুর্বলতা মনে করা কখনো সমীচীন নয়। কিন্তু বাংলাদেশে পাকিস্তান ও চীনপন্থীরা তাই করে চলেছে।

নাটের গুরু চীন, আমেরিকা ও পাকিস্তান বরাবরই বাংলাদেশের বিরোধিতা করে আসছে। দেশটির ভালো তাদের কাছে গাত্রদাহের কারণ হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ এগিয়ে গেলে তাদের জ্বালা বেড়ে যায়। দেশটির ক্ষতি করার জন্য তারা কূটনৈতিক বেহায়াপনাকেও বহুবার বিশ্ববাজারে উন্মুক্ত করেছে। আধুনিক সভ্য জগতে এই বেহায়াপনা সবাইকে লজ্জিত করে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে প্রকাশ্য পুতুলনাচ বন্ধ করা দরকার। দেশটি নিজের মতো করে এগিয়ে গেলে, উন্নতি লাভ করলে, সমৃদ্ধ হলে দোসরদের যে কষ্ট হয় তা বোঝা উচিত। ইদানীংকালে ইউটিউব কিংবা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে দেশটির সঙ্গে ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য যারা দায়িত্ব নিয়ে আছে তাদের চিহ্নিত করা দরকার। এখনই উপযুক্ত সময় তাদের চিহ্নিত করে চিরতরে বর্জন করার। জঙ্গিপনা, জ্বালাও-পোড়াও, সম্পদ বিনষ্ট করা, মানুষ হত্যা করা, জনস্বার্থ নষ্ট করা, জন উন্নয়ন বিঘ্নিত করা কোনো দেশে কোনোকালেই প্রতিবাদের কিংবা বিরোধিতার ভাষা হতে পারে না। বাংলাদেশ কারণে-অকারণে বহুবার রক্তরঞ্জিত হয়েছে। রাজপথে রক্তের দাগ শুকাতে না শুকাতেই আবার রক্তের বন্যা বইয়ে দেওয়ার যে অপসংস্কৃতির বিষবৃক্ষ বেড়ে উঠেছে তা চিরতরে দৃঢ় সাহসের সঙ্গে নির্মূল করা উচিত সরকারের।

বিশ্ব শান্তি, ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অটুট রাখার জন্য, কারণে- অকারণে ভারতের বিরোধিতা এবং অশ্লীল স্লোগান আজকে অর্থহীন এবং বড়োই বেমানান। অপ্রাসঙ্গিকও বটে। বাংলাদেশের মানুষকে এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। □

কার্গিলে পাকিস্তানের পাশে ছিল চীন

হীরক কর

ভারত যাতে কার্গিল যুদ্ধে পাকিস্তানের সঙ্গে পেরে উঠতে না পারে তার জন্য পাক বাহিনীর পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছিল চীনা আর্টিলারি বাহিনীও। এই তথ্য সম্প্রতি ভারতীয় গোয়েন্দা এজেন্সির কাছে এসেছে। ইজরায়েলের গুপ্তচর সংস্থা 'মোসাদ'। 'মোসাদ'-এর খবর কার্গিল যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে ১৯৯৯ সালের ২৮ মার্চ তৎকালীন পাক সেনাপ্রধান পারভেজ মুশারফ 'লাইন অব কন্ট্রোল' বা 'এলওসি' পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। আর ভারতে নাকি এক রাত কাটিয়েও গিয়েছিলেন। তিনি এসেছিলেন কাশ্মীরি মুজাহিদের ভেকধারী পাকিস্তানি সেনাদের ভারতে ঢুকিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা সরেজমিনে দেখতে। আর কার্কিল যুদ্ধ শুরু হয় ঠিক তার একমাস পাঁচ দিন বাদেই। ৩ মে, ১৯৯৯ সালে।

কার্গিল যুদ্ধ ১৯৯৯ সালের মে-জুলাই মাসে কাশ্মীরের কার্গিল জেলায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংগঠিত একটি সশস্ত্র সংঘর্ষ। পাকিস্তানি ফৌজ ও কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাবাদীরা উভয় দেশের মধ্যে ডি ফ্যাক্টো সীমান্তরেখা হিসেবে পরিচিত নিয়ন্ত্রণ রেখা বা লাইন অব কন্ট্রোল পেরিয়ে ভারতে ঢুকে পড়লে এই যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

শুরুতে, ভারতীয় সৈন্যরা বিশ্বাস করেছিল যে অনুপ্রবেশকারীরা সন্ত্রাসবাদী বা 'জিহাদি' ছিল। তারা এসেছিল একটি উগ্র এজেন্ডা নিয়ে। যাইহোক, ঘটনাগুলো উন্মোচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আক্রমণটি একটি বৃহত্তর এবং আরও সংগঠিত পরিকল্পনার অংশ ছিল। পার্বত্য অঞ্চলে অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকে অনেকগুলি শৃঙ্গ কবজা করে। জবাবে, ভারত নিজ এলাকা পুনরুদ্ধারে এই অঞ্চলে ২ লক্ষেরও বেশি ভারতীয় সৈন্য মোতায়েন করে।

যেহেতু এই অঞ্চলে প্রবল তুষারপাত হয়, পাকিস্তান সেনাবাহিনী ধরে নিয়েছিল যে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যুত্তর দিতে পারবে না বা প্রতিক্রিয়া ধীর হবে। যে ভূখণ্ডে 'অপারেশন বিজয়' হয়েছিল, সেটি হিমালয়ের সুউচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে তাপমাত্রা মাইনাস ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াসেও নেমে যায়। অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে মুজাহিদিন গ্রুপ এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নর্দার্ন লাইট ইনফ্যান্ট্রির সদস্য উভয়ই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর সামনে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ ছিল। ২৬ মে, ১৯৯৯ নাগাদ, ভারতীয় সেনাবাহিনী 'অপারেশন বিজয়' নামে তাদের অফিসিয়াল অপারেশন শুরু করে। ভারতীয় সেনা পাক-অনুপ্রবেশকারীদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। যদিও প্রাথমিকভাবে, পাকিস্তান তাদের জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অবস্থানগত সুবিধার জন্য হিমালয় পর্বতের সুউচ্চ শৃঙ্গগুলি ব্যবহার করেছিল।

১৯৯৯ সালের গ্রীষ্মে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কার্গিল যুদ্ধ হয়। এটি ৩ মে থেকে শুরু হয় এবং ২৬ জুলাই এর মধ্যে শেষ হয়ে যায়। এই যুদ্ধে শত শত সৈন্য নিহত হয় এবং হাজার হাজার আহত হয় এবং পাকিস্তান পরাজিত হয়। বিশ্বাস করা হয় যে পাকিস্তানের এই অনুপ্রবেশের পিছনে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কাশ্মীর ইস্যুটিকে সামনে নিয়ে আসা।

এলওসির ভূখণ্ড যা রুক্ষ এবং যেখানে ভারী তুষারপাত হয়, সেই এলাকাকে এই উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো হয়েছিল। এটি এই ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল যে ভারতীয় সেনাবাহিনী পাক অনুপ্রবেশ 'ট্র্যাক' করতে সক্ষম হবে না বা ট্র্যাক করলেও ভারী তুষারপাতের কারণে তাদের পক্ষে চলাচল করা কঠিন হবে। কার্গিল লাদাখ অঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এবং শ্রীনগর, লেহ এবং এই জাতীয় অন্যান্য এলাকার কাছাকাছি। শ্রীনগর-লেহ জাতীয় সড়কের ওপর হওয়ায়, কার্গিল অঞ্চলটি পরিবহণ ও বাণিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

চ্যালেঞ্জিং ভূখণ্ডে এই কঠিন যুদ্ধকে জয় করতে, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী যে সামরিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেছিল তা নজরদারি এবং যোগাযোগ রক্ষায় সক্ষম ছিল। আনম্যানড্ এরিয়াল ভেহিকল (ইউএভি) এবং আনম্যানড্ এরিয়াল সার্ভেইল্যান্স (ইউএএস) ব্যবস্থার মাধ্যমে সেনাবাহিনীর পক্ষে শত্রু সৈন্যদের গতিবিধি জানা সম্ভব হয় এবং প্রযুক্তি-নির্ভর এই ব্যবস্থা সেনাকে সংগঠিত হতে সাহায্য করে। যোগাযোগ এবং প্রযুক্তি যুদ্ধের গতিপথ নির্ধারণ করতে পারে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে প্রযুক্তিগত সমন্বয় তখনই সম্ভব যখন নির্দিষ্ট এলাকায় মোতায়েন সৈন্যদের নিজেদের মধ্যে ছাড়াও অন্যান্য ইউনিট এবং তাদের সদর দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ থাকে। কার্গিল যুদ্ধের সময়ে, ভারতীয় সেনাবাহিনী যোগাযোগ ব্যবস্থা সুরক্ষিত রাখতে স্যাটেলাইট সিস্টেমের ওপর নির্ভর করেছিল।

অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে

সাহায্য করার জন্য বায়ুসেনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তাদের অপারেশনের কোড নাম ছিল 'অপারেশন নিরাপদ সাগর'। যা বিমান বাহিনী শুরু করেছিল। তবে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিল কার্গিলের ভূখণ্ড। আর বিমান বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ রেখার মধ্যে থাকতে হয়েছিল।

উচ্চতার যুদ্ধে ঝুঁকি অপরিসীম। কার্গিল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪৫০০-৫৫০০ মিটার উপরে থাকায় যুদ্ধ বিমানগুলোকে ৬১০০ মিটার উচ্চতায় থাকার কথা ছিল। গ্রাউন্ড অ্যাটাক এয়ারক্রাফট মিগ-২১ এস, মিগ-২৩ এস, মিগ-২৭ এস, মিরাজ ২০০০ এবং জাগুয়ার এই উদ্দেশ্যে মোতায়েন করা হয়েছিল। বলা হয়, বিমান হামলা— শত্রু শিবিরে আঘাত হানা এবং তাদের প্রয়োজনীয় সরবরাহ করার ক্ষমতা মারাত্মকভাবে হ্রাস করে।

পার্বত্য অঞ্চলে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য কেন সৈন্যদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন তার একটি নিখুঁত উদাহরণ কার্গিলের যুদ্ধ। পদাতিক বাহিনীকে মাইনাস ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তীব্র শীতের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়েছিল। অনুপ্রবেশকারীদের মোকাবিলা করতে এবং তাদের পরাজিত করতে পদাতিক বাহিনী এবং আর্টিলারির মধ্যে সমন্বয় ছিল। সমন্বিত প্রচেষ্টায়, প্রথম যে রিজলাইনটি পুনরুদ্ধার হয় তা হলো দ্রাস উপ-সেক্টরে টোলোলিং। পরবর্তীকালে, টাইগার হিল পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। এছাড়াও সামরিক অপারেশনের মাধ্যমে গান-হিল, যা পূর্বে পয়েন্ট ৪৮৭৫ নামে পরিচিত ছিল তা ৭ জুলাই, ১৯৯৯ পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল।

রেজিমেন্ট অব আর্টিলারি তাদের নির্ভুল কৌশলের মাধ্যমে শত্রু সৈন্যদের মোকাবিলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে, আর্টিলারি পাকিস্তানি অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করে। যদিও পরবর্তীকালে কার্গিলের মতো উচ্চতায় কখনও সেনা মোতায়েন করা হয়নি।

মেজর জেনারেল জগজিৎ সিংহ ডিফেন্স রিভিউতে লিখেছেন, 'সরাসরি গোলাগুলি (বিশেষ করে বোফর্সের দ্বারা ফায়ার করা গোলা) শত্রুদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায় এবং শত্রুর বাঙ্কার ধ্বংস করার ক্ষেত্রে একটি বিধ্বংসী প্রভাব ফেলেছিল'। তিনি আরও জানান, ভারতীয় আর্টিলারি কার্গিল সংঘাতের সময় ২,৫০,০০০ এরও বেশি শেল, বোমা এবং রকেট নিক্ষেপ করেছিল এবং ৩০০টি বন্দুক, মর্টার এবং এমবিআরএল থেকে প্রতিদিন প্রায় ৫,০০০টি আর্টিলারি শেল, মর্টার বোমা এবং রকেট নিক্ষেপ করা হয়েছিল। কামান এবং তাদের ফায়ার পাওয়ারের কারণে শত্রুপক্ষের সর্বোচ্চ সংখ্যক হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।

ইউএভিগুলোকে প্রায়শই ড্রোন হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ক্রমাগত নজরদারি নিশ্চিত করতে এবং শত্রু সৈন্যদের জানার জন্য ব্যবহার করা হতো। এটি বিশেষভাবে কার্যকর। কারণ চালকবিহীন যানবাহন আমাদের ভারতীয় সেনাদের হারানোর ঝুঁকি এড়াতে দেয়। স্যাটেলাইট ছবি এবং অন্যান্য উৎস থেকে সংগৃহীত ইনফরমেশন ছিল সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

একটি যুদ্ধে সেনাবাহিনীর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য সরবরাহ চেইন ব্যবস্থা বজায় রাখা অপরিহার্য। কার্গিলের অঞ্চল এবং কঠোর জলবায়ু পরিস্থিতি বিবেচনা করে, একটি সুসংহত ব্যবস্থা নিশ্চিত করা চ্যালেঞ্জ ছিল। যদিও সম্ভাব্য জায়গায় সড়ক পরিবহণ ব্যবহার করা হয়েছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনীকে প্রয়োজনীয় মালপত্র সরবরাহ করার জন্য হেলিকপ্টারগুলো কাজে এসেছিল।

নিরাপদ সড়ক, মজবুত সেতু, হেলিপ্যাড তৈরি করা ছিল প্রাথমিক কাজ। পরিবহণ ব্যবস্থা নিরাপদ হলেই চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া যেত। কার্গিলের যুদ্ধ খুব কঠিন ছিল না। সকলেরই জানা ছিল সেনাদের চিকিৎসার প্রয়োজন হবে। বিমান বাহিনী আহত সেনাদের চিকিৎসা সহায়তা এবং সরিয়ে নেওয়ার জন্য পদক্ষেপ নেয়।

ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রস্তুতি পুরোমাত্রায় ছিল। প্রথমত, তারা পাকিস্তানের দ্বারা কোনও আকস্মিক আক্রমণের ক্ষেত্রে ভারতীয় সমুদ্র সীমার সম্পূর্ণ সুরক্ষা নিশ্চিত করেছিল। সমুদ্রে ভারতীয় নৌবাহিনীর ক্রমাগত নজরদারির চলছিল। ভারতীয় নৌবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের সাংকেতিক নাম ছিল 'অপারেশন তলওয়ার'।

এই সময় নৌবাহিনী তার পূর্ণ শক্তি দেখিয়েছে, পাকিস্তানকে ইঙ্গিত দিয়েছে যে পরিস্থিতি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে পরিণত হলে ভারত উপযুক্ত জবাব দেবে। এবং কোনো সংযম দেখাবে না। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর কাছে একটি স্পষ্ট বার্তা ছিল যে তাদের কার্গিল অতিক্রম করার ইচ্ছা থাকলে ভারতীয় নৌবাহিনী প্রয়োজনীয় জবাব দেবে এবং দক্ষিণ ও পূর্ব নৌবহর এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমী নৌবহরের সঙ্গে একত্রিত হয়েছিল।

শুরুতে পাকিস্তান যুদ্ধে তার সেনাযোগ অস্বীকার করে। প্রাথমিকভাবে কাশ্মীরি জঙ্গিদের দায়ী করে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ এবং পাকিস্তানের সেনাপ্রধান পারভেজ মোশারফের বিবৃতি এই যুদ্ধে তাদের যুক্ত থাকার ইঙ্গিত দেয়।

গোপনে পাকিস্তান 'অপারেশন বদর' নামে ভারতীয় ভূখণ্ডে তার বাহিনী পাঠিয়ে কার্গিল এলাকা দখল করে। অনুপ্রবেশের এজেন্ডা ছিল কাশ্মীর থেকে লাদাখকে বিচ্ছিন্ন করা এবং সাপ্লাই লাইন কেটে দিয়ে সিয়াচেন উপত্যকার বাসিন্দাদের ক্ষুধার্ত করে ভারতকে পাকিস্তানের শর্ত মেনে নিতে বাধ্য করা। কার্গিল যুদ্ধে বিমানবাহিনীর অপারেশনের নাম ছিল অপারেশ হোয়াইট সি এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী একে অপারেশন বিজয় বলে অভিহিত করেছে। ভারতীয় নৌবাহিনীর অভিযানের কোড নাম ছিল অপারেশন তলওয়ার।

ভারতীয় বিমান বাহিনী সফলভাবে পাকিস্তানের অবৈধ পোস্টগুলো ধ্বংস করে এবং ২৬ জুলাই ভারত পাকিস্তানি সেনাদের ভূখণ্ড থেকে উচ্ছেদ করে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপারেশন বিজয়ের অধীনে কার্গিলকে সুরক্ষিত করতে বিশেষ বাহিনীর সঙ্গে প্রায় ৩০,০০০ সৈন্য কার্গিল এলাকায় চলে আসে। অপারেশন হোয়াইট সি, বা সফেদ সাগর ১৯৯৯ সালে কার্গিল যুদ্ধের সময় চালু হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং ভারতীয় বিমান বাহিনীর সঙ্গে যৌথভাবে, ভারতীয় নৌবাহিনী অপারেশন তলওয়ারের মাধ্যমে পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি করে।

কার্গিল যুদ্ধের ফলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৫২৭ জন্য সৈন্য নিহত হয়। যেখানে পাকিস্তানের পক্ষে, মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৩৫৭ থেকে ৪৫৩-র মধ্যে। কার্গিল যুদ্ধের সময় ভারত তার অন্যতম সাহসী সৈন্য, ক্যাপ্টেন বিক্রম বাত্রাকেও হারিয়েছিল। তাই ২৬ জুলাই দিনটিতে কার্গিল যুদ্ধে বীরগতিপ্রাপ্ত ভারতীয় সেনাদের সম্মান জানানো হয়। ক্যাপ্টেন বিক্রম বাত্রা তাঁর মৃত্যুর পর ভারতের সর্বোচ্চ বীরত্বের সম্মান পরম বীর চক্রে ভূষিত হন। 'শেরশাহ' নামে একটি চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছিল যা ক্যাপ্টেন বিক্রম বাত্রার জীবন কাহিনিকে বিশদভাবে চিত্রিত করে। □

অহল্যাবাঈ হোলকর
ভারতীয় নারীর আদর্শ

সুতপা বসাক ভড়

মহারাষ্ট্রের ওরঙ্গাবাদ জেলার চৌতে গ্রামে বসবাসকারী মাণকোজী সিন্ধের কন্যা ছিলেন দেবী অহল্যাবাঈ। ১৭২৫ সালের ৩১ মে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পেশোয়ার সৈন্যরা ১৭৪৩ সালে তাঁদের গ্রামের পার্শ্ববর্তী স্থানে শিবির স্থাপন করে। মলহার রাও হোলকরও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে একদিন পেশোয়া মাণকোজীর আট বছরের সুলক্ষণা কন্যা অহল্যাকে দেখে প্রীত হন। তাঁর পরম বিশ্বাসী ও প্রিয় সহচর মলহার রাওয়ের পুত্র খণ্ডুজীর সঙ্গে অহল্যার বিবাহ স্থির করা হয়। যথাসময়ে খণ্ডুজী এবং অহল্যাবাঈ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

এদিকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে খণ্ডুজীর মধ্যে অবাধ্যতা, আরামপ্রিয়তা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতার মতো লক্ষণগুলি প্রকট হয়ে ওঠে। অপরদিকে শ্বশুর এবং শাশুড়ির প্রেরণায় অহল্যাবাঈ হয়ে ওঠেন কর্তব্যপরায়ণা এবং বুদ্ধিমতী। মলহার রাও তাঁর ওপর অনেক রাজকার্যের দায়িত্ব দেন। যুদ্ধ অভিযানেরও বহু ক্ষেত্রে অহল্যাবাঈকে সঙ্গে নিয়েছেন।

খণ্ডুজী ও অহল্যাবাঈয়ের দুটি সন্তান ছিল— পুত্র মালেরাও এবং কন্যা মুক্তাবাঈ। ১৭৫৪ সালে খণ্ডুজীর মৃত্যু হলে অহল্যাবাঈ সতী হবার জন্য মনস্থির করলে, বৃদ্ধ শ্বশুরমশাই মলহার রাওয়ের আকুতিতে বিরত হন এবং সকল শক্তি নিয়োগ করেন রাজ কাজে। সাংসারিক সুখের অসারতা অনুভব করলেন মর্মে মর্মে। অধিকাংশ সময় ধ্যান-জপ, ধর্মচিন্তা, ধর্মশাস্ত্র আলোচনা ও পূজা অর্চনায় অতিবাহিত করতেন।

মলহার রাওয়ের মৃত্যুর পরে সুবেদার পদে আসীন হন অহল্যাবাঈয়ের পুত্র মালেরাও। মালেরাওয়ের বোনের শাসন করার ক্ষমতা না থাকায় কার্যত শাসিকা ছিলেন অহল্যাবাঈ। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ প্রশাসিকা এবং নিরপেক্ষ বিচারশক্তিসম্পন্না নারী। তাঁর মূল নীতি ছিল সাম এবং দান। তবে প্রয়োজনে তিনি ছিলেন কঠোর। তাঁর রাজত্বকালের শুরুতে একদল প্রজা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে, তিনি নিজেই সৈন্য নিয়ে এগিয়ে যান এবং বিদ্রোহ দমন করেন। পরবর্তীকালে অপর একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর দলপতিকে প্রাণদণ্ড দেন, তাঁর বিদ্রোহ দমনের কঠোর নীতি, বাকি সকল বিদ্রোহকে শান্ত করে দেয়।

এদিকে তাঁর দুর্বলচিত্ত পুত্র মালেরাওয়ের মৃত্যুর পর পেশোয়ার কাকা রাখবা অহল্যাবাঈয়ের রাজ্য আক্রমণের চেষ্টা করলে শোকাগ্রস্তা অহল্যাবাঈ তাঁর আত্মমর্যাদা বিস্মৃত হননি। একটি নারীবাহিনী গঠন করে তিনি রাখবাকে বার্তা পাঠান, 'আমার মনে হচ্ছে, আপনি আমার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে সাক্ষাৎ করতে চান। আমি এর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আমি একজন নারী মাত্র! আমি যদি যুদ্ধে পরাস্তও হই, তাহলেও আপনার মহিমা বৃদ্ধি হবে না। কিন্তু চিন্তা করে দেখুন, যদি যুদ্ধের ফলটি বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়— তাহলে আপনার দশাটি কেমন হবে?' রাখবা অহল্যাবাঈয়ের দৃঢ় মনোভাব বুঝতে পারেন এবং জানান তিনি তাঁকে পুত্রশোকে সান্ত্বনা দেবার জন্য সাক্ষাৎ করতে আসছেন।

এর কয়েকবছর পরে কন্যা মুক্তাবাঈ স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যান। এই ঘটনায় তিনি খুবই মনেকষ্ট পান। কঠোর তপশ্চর্যায় জীবনযাপন করতে থাকেন। ১৭৯৫ সালের ১৩ আগস্ট তিনি অমৃতলোকের পথে যাত্রা করেন। এরই মধ্যে তিনি প্রজাদের মঙ্গলার্থে প্রচুর পথ নির্মাণ, ঘাট বাঁধানো, কূপ খনন, অতিথিশালা নির্মাণ, মন্দির নির্মাণ করেন। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো কলকাতা থেকে বেনারস পর্যন্ত পথ নির্মাণ, সৌরাষ্ট্রের সোমনাথ মন্দির, গয়ার বিষ্ণু মন্দির ও বারাণসীর বিশ্বেশ্বর মন্দির।

আপাত দৃষ্টিতে দেবী অহল্যাবাঈ ছিলেন তাঁর রাজ্যের (ইন্দোর) সর্বময়ী কর্ত্রী, কিন্তু অতি অল্প বয়সে স্বামীহারা হন। এরপর ক্রমে ক্রমে পুত্র-কন্যা বিয়োগ হয়। ব্যক্তিগত জীবনে সর্বহারা হয়েও তিনি তাঁর দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে সদা সচেতন ছিলেন। সন্তানসম প্রজাদের মঙ্গলার্থে কল্যাণময়ী ভূমিকা ছিল তাঁর, অপরদিকে দুষ্টদমনে ছিলেন কঠোরতম। একজন নারী হয়েও প্রয়োজনানুসারে যুদ্ধক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন। একজন সুদক্ষ রাজনীতিবিদ, প্রশাসনিক অথচ ঈশ্বরের চরণে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে ছিল সারল্য ও তপশ্চর্যা। নিজ জীবনে সব হারিয়েও দেশের জন্য কর্তব্যবোধ, দায়িত্ববোধ, ন্যায় পরায়ণতা, ধর্মপরায়ণতাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন।

বর্তমানে আমাদের মহিলাদেরও অনেক বিপরীত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। বিব্রত, অস্থিরচিত্ত না হয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া, দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ, ধর্মবোধ ইত্যাদিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে জীবনের পথে এগিয়ে চলার দিশা আমরা পাই দেশের পুজারিণী দেবী অহল্যাবাঈ হোলকারের জীবন থেকে। তাঁর জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছে :

'ইদম্ ন মম, ইদম্ রাষ্ট্রায় স্বাহা।' □

সাইনোসাইটিসের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

সাইনোসাইটিস সকলের হতে পারে?

হ্যাঁ, সাইনাসে প্রদাহ হলেই তাকে সাইনোসাইটিস বলা হয়। নাকের মতো সাইনাসের মধ্যেও মিউকাস থাকে যা পুরোনো হয়ে গেলে নিয়মিত নাকের গহ্বর দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং নতুন মিউকাস তৈরির জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়। কিন্তু সাইনাসে প্রদাহ হলে সেই মিউকাস আর বেরোতে পারে না। সমস্যার সূত্রপাত হয় তখনই। নাক বুজে যায়, মাথার যন্ত্রণা হয়। ঠাণ্ডালাগা মানেই কিন্তু সাইনোসাইটিস নয়। কিন্তু সাইনোসাইটিসের প্রধানতম কারণ হলো ঠাণ্ডা লাগা যা দূষণের কারণে ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী।

সাইনাস কোথায় থাকে?

আটটি সাইনাস থাকে সকলের। সবকটিই বাতাস ভরা প্রকোষ্ঠ। এক জোড়া করে ফ্রন্টাল সাইনাস (কপালে), ম্যাক্সিলিয়ারি সাইনাস (নাকের দুপাশে গালে) এবময়েড সাইনাস (দু চোখের পিছনে মস্তিষ্কের নীচে), স্ফিনয়েড সাইনাস থাকে (চোখের পিছনে)।

সাইনাস মানেই কি মাথার যন্ত্রণা?

সবক্ষেত্রে তা নাও হতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে সর্দি নেই মনে হলেও অনেকের সাইনাসে সংক্রমণ বা প্রদাহটা থেকে যায়। সাইনাসের মূল কাজ হলো প্রশ্বাস নেওয়ার সময়ে বাতাস কে শোষণ করা এবং কণ্ঠস্বরের রেজোন্যান্স বা ধরন ঠিক করা। তাই সর্দির সময়ে অনেকেরই কণ্ঠস্বর বদলে যায়। ব্যথা বা অন্য অস্বস্তি না থাকলেও ঠাণ্ডা লাগার পরে যদি কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক না হয় দীর্ঘদিন ধরে, তখন ইএনটি বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নেওয়া উচিত।

ক্রনিক সাইনোসাইটিস কি সারে?

হ্যাঁ, বিলক্ষণ সারে। অধিকাংশ থেকে ঠাণ্ডা লাগা এড়িয়ে এবং চিকিৎসকের পরামর্শে যথাযথ ওষুধ খেলেই সেরে যায় সাইনোসাইটিস। দরকার পড়লে অ্যান্টি-অ্যালার্জিক, অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে। ওষুধে না সারলে অপারেশনও করতে হতে পারে।

সব সাইনোসাটিস রোগীরই কি যন্ত্রণা নিত্যসঙ্গী?

ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। সাধারণত অ্যাকিউট সাইনোসাইটিসে মারাত্মক যন্ত্রণা নিত্যসঙ্গী। সেই যন্ত্রণা সকালে ঘুম ভাঙার পর থেকেই শুরু হয়। আর বেলা বাড়তে থাকলে সে যন্ত্রণা কমতে থাকে। সাধারণত দুপুরের দিকে যন্ত্রণা গায়েব হয়ে যায়।

সন্ধ্যার পর অনেক সময়েই তা ফের বেড়ে যায়। কিন্তু ক্রনিক সাইনোসাইটিসে এরকম মারাত্মক যন্ত্রণা হয় না। তাতে সাধারণত সারাক্ষণ মাথা আর নাকের দু'পাশের গাল ভারী হয়ে থাকে। সঙ্গে নাক দিয়ে জল পড়ে। আবার নাক বুজে থাকায় স্বাভাবিক শ্বাস নেওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রে হাঁচিও হয়। এই ধরনের রোগীদের যদি কখনও যন্ত্রণা হয়, তখন অবিলম্বে ডাক্তার দেখাতে হবে।

শীতে কেন সাইনাসের ঝামেলা বাড়ে?

শীতে বায়ু দূষণেও অ্যালার্জি বাড়ে। সে কারণেই বছরের অন্য সময়ের তুলনায় বিশেষত শীতকালে সাইনাসের প্রদাহ বাড়ে। এক্ষেত্রে হোমিও চিকিৎসা ফলপ্রসূ। □

কেন্দ্রীয় অর্থ বাজেট ২০২৪-’২৫ এবং ভারতীয় রেল

বিমল শঙ্কর নন্দ

২০১৭-২০১৮-র আগে পর্যন্ত দেশের অর্থনীতিবিদ, শেয়ার মার্কেটের কারবারি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সকলেই দুটি বাজেটের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতো। একটি অবশ্যই ছিল দেশের সাধারণ বাজেট এবং অপরটি রেল বাজেট। কখনও কখনও রেল বাজেট বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফেলতো কারণ রেল বাজেটেই ভাড়া বাড়ানোর সংস্থান থাকতো এবং এই ভাড়া বৃদ্ধি রেলের নিয়মিত ব্যবহারকারীদের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে থাকে। আর বিরোধী দলগুলিও এই সুযোগ ছাড়তো না। ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে রে রে করে মাঠে নেমে পড়তো। বিশেষত ভারতের বাম দলগুলির কাছে এই বিষয়টা তো ছিল এক ‘বাৎসরিক উৎসব’। রেল বাজেটের পরের দিন থেকেই রেল অবরোধ, সঙ্গে কমবেশি রেলের সম্পত্তি নষ্ট, কয়েকদিন তর্জন গর্জনের পর আবার স্বাভাবিক অবস্থা। বহুদিন এটাই ছিল বাজেট পরবর্তী ভারতীয় রাজনীতির স্বাভাবিক চিত্র।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এমন ঘটনাও প্রায়শই ঘটতো সেখানে সিপিআই (এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার ভালো পরিমাণে বাস-ট্রাম-লঞ্চের ভাড়া বাড়িয়েছে, সেই ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশ গুলি চালিয়েছে, মানুষের মৃত্যু ঘটেছে আর রেল বাজেটে ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সেই সিপিআই (এম) তার সহযোগী বামদলগুলিকে নিয়ে ‘সার্বিক গণ-আন্দোলনে’ নেমে পড়েছে। আসলে গণ আন্দোলনের নামে সরকারের সম্পত্তি ধ্বংস করে, বহু কোটি টাকার আয় বন্ধ করে বামদলগুলি জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব কিংবা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে এক ইঞ্চিও এগোতে না পারুক, স্বপ্নটা হয়তো মনে মনে বাঁচিয়ে রাখতো। এমন বহু রাজনৈতিক ভণ্ডামির ঘটনাও বাজেটোত্তর ভারতীয় রাজনীতি প্রত্যক্ষ করেছে।

ব্রিটিশ ভারতে ১৯২৪ সালে একওয়ার্থ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রেল বাজেটকে কেন্দ্রীয় সরকারের সাধারণ বাজেট থেকে আলাদা করা হয়। স্বাধীন ভারতেও একই ব্যবস্থা চলছিল ২০১৬-’১৭ অর্থবর্ষ অবধি। ১৯৪৭ সালের ২০ নভেম্বর স্বাধীন ভারতের প্রথম রেল বাজেট পেশ করেন জন মাথাই। পরবর্তী সময়ে ২০১৭-১৮ সালে, প্রয়াত অরুণ জেটলি যখন ভারতের অর্থমন্ত্রী ছিলেন,

সেই সময় রেল বাজেটকে সাধারণ বাজেটের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এর প্রধান কারণ ছিল এই যে রেলের উন্নয়নকে সরকারের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি অংশে পরিণত করা। রেলের উন্নয়ন ভারত সরকারের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি অংশ এতে কোনো সন্দেহ নেই। তার সঙ্গে রেল হয়ে উঠেছিল ভারতীয় রাজনীতিরও একটা অংশ। বিশেষত ১৯৮৯ সাল থেকে ভারতীয় রাজনীতি কোয়ালিশন যুগে প্রবেশ করার পর ব্যাপকভাবে ভারতীয় রেলকে নিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। পশ্চিমের উন্নত দেশগুলি কিংবা প্রাচ্যের জাপান যখন এক আধুনিক উন্নত যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে রেলকে গড়ে তুলেছে দলীয় রাজনীতি চরিতার্থ করার অভিসন্ধি ভারতীয় রেলকে ঠেলে দিয়েছে একেবারে পিছনের দিকে।

লালুপ্রসাদ যাদব কিংবা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে রেল ছিল তাদের রাজনৈতিক উচ্চাশা পূরণের একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আর্থিক লাভ কিংবা কার্যকারিতা বিচার না করে নিজের রাজ্যে এমনকী নিজের নির্বাচনী এলাকায় রেল প্রকল্প স্থাপন করা, নিরাপত্তা কিংবা পরিকাঠামো উন্নয়নকে বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে ট্রেনের সংখ্যা বাড়িয়ে যাওয়া, আর্থিক সংস্থান না রেখে নতুন নতুন প্রকল্প ঘোষণা করে যাওয়া— সব মিলিয়ে ভারতীয় রেল হয়ে উঠেছিল বেশ ধারালো এক রাজনৈতিক অস্ত্র। লালুপ্রসাদ যাদব তো ‘জনগণের সুবিধা’-র নামে রেলের ভাড়াও কমিয়ে দিয়েছিলেন। এই সমস্ত রাজনৈতিক খামখেয়ালিপনার মূল্য দিচ্ছিল ভারতীয় রেল। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে ২০১২ সালে রেলমন্ত্রী হিসেবে তাঁর বাজেট বক্তৃতায় দীনেশ ত্রিবেদী হতাশার সুরে বলেছিলেন ‘ভারতীয় রেল একেবারে আইসিইউ-তে চলে গেছে’। প্রসঙ্গত সেই সময় দীনেশ ত্রিবেদী ছিলেন ইউপিএ জোট সরকারের রেলমন্ত্রী এবং তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা। এই কথা বলার জন্য এবং বাজেটে ভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব করার ফলে শ্রী ত্রিবেদীকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে

ভর্ৎসনা করা হয়। রেলমন্ত্রী পদ থেকেও তিনি অপসারিত হন।

২০১৭-১৮ অর্থবর্ষ থেকে রেল বাজটকে দেশের সাধারণ বাজটের সঙ্গে একসঙ্গে পেশ করা শুরু হয়। লক্ষ্য ছিল একটাই। রেলকে দেশের সস্তা রাজনীতির আওতামুক্ত করা এবং দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে রেলের উন্নয়ন ঘটানো। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার ২০১৪ সাল থেকেই ভারতীয় রেলব্যবস্থাকে বিশ্বমানের স্তরে উন্নীত করতে আগ্রহী। একদিকে যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা, অন্যদিকে উন্নত পরিকাঠামো এবং আধুনিকতা— এই লক্ষ্যেই ভারতীয় রেলকে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয় মোদী সরকার। সম্প্রতি রেলকে যুক্ত করা হয়েছে পিএম গতিশক্তি প্রকল্পের সঙ্গে। ২০১৪ সালেই সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে রাজনৈতিক কারণে কোনো জনমোহিনী প্রকল্প ঘোষণা না করে আগে যে প্রকল্প ঘোষণা হয়ে গেছে সেগুলিকে শেষ করতে হবে। বিশ্বমানের রেল কোচ উৎপাদন করতে হবে, স্টেশন চত্বরগুলোকে সুন্দর করে সাজাতে হবে। রেলে ইলেকট্রিফিকেশন-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া শুরু হলো। যতটা সম্ভব সিঙ্গল লাইনকে ডাবল লাইনে পরিণত করার কাজও শুরু হলো। রেলকে সত্যিকারের গতিশীল বাহনে পরিণত করতে বন্দে ভারত, নমো ভারতের প্রবর্তন করা হলো। আর অল্প কিছুদিনের মধ্যে দেশে চালু হয়ে যাবে বুলেট ট্রেন। ২০১৭-১৮ সাল থেকেই রেলের জন্য, এবার বাজেট বরাদ্দ এই লক্ষ্যগুলির দিকে তাকিয়েই করা হয়েছে।

২০২৪-২৫ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে রেলের জন্য বাজেট বরাদ্দ এবং পরিকাঠামো উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দও উপরোক্ত লক্ষ্যগুলির দিকে তাকিয়ে করা হয়েছে। এছাড়া সাম্প্রতিক রেল দুর্ঘটনাগুলির (২ জুন ২০২৩-এ ঘটা করমণ্ডল এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনা এবং ১৭ জুন ২০২৪ তারিখে ঘটা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনা) কথা মাথায় রেখে রেল সুরক্ষার জন্য প্রচুর পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বাজেটে রেলের জন্য বাজেট বরাদ্দ ধার্য করা হয়েছে ২.৫২ লক্ষ কোটি টাকা যা তার আগের অর্থবর্ষের চেয়ে প্রায় ৫ শতাংশ বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের বাজেটে এই বরাদ্দ ছিল ২.৪২ লক্ষ কোটি টাকা। ২.৫২ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ এবং আরও দশ হাজার কোটি টাকার বাজেট বহির্ভূত বরাদ্দ নিয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ভারতীয় রেলের মোট মূলধনী ব্যয় বা capital expenditure বা ক্যাপেক্স দাঁড়াবে ২.৬২ লক্ষ কোটি টাকা। এটি একটি রেকর্ড। গত ৫ বছরে রেলে এই মূলধনী ব্যয় প্রায় ৭৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৯-২০ সালে সেখানে মূলধনী ব্যয় ছিল ১.৪৮ লক্ষ কোটি টাকা ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে তা দাঁড়িয়েছে ২.৬২ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থাৎ বৃদ্ধির পরিমাণ ৭৭ শতাংশ। এই মোট বাজেট বরাদ্দের মধ্যে ১.৮ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে রেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তপোক্ত করার জন্য। এই অর্থ খরচ করা হবে পুরানো রেল লাইন বদলানো, সিগন্যাল ব্যবস্থা উন্নত করা, ফ্লাইওভার এবং আন্ডারপাস তৈরি এবং দুর্ঘটনা নিরোধক কবচ ব্যবস্থা স্থাপন করার কাজে। ২০১৪ সাল সময়কালে রেলের ক্যাপেক্স বিনিয়োগ ছিল ৩৫ হাজার কোটি টাকার মতো। সেটাই আজ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২.৬২ লক্ষ কোটি টাকা।

ভারতীয় রেলে আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া যে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলছে তা কতগুলি পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যায়। গত ১০ বছরে ভারতীয় রেলে ৩১১৮০ কিলোমিটার নতুন লাইন পাতা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে সেখানে দৈনিক মাত্র চার কিলোমিটার নতুন লাইন পাতা হতো ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে দৈনিক ১৪.৫৪ কিলোমিটার লাইন পাতা হয়েছে। ২০১৪-২০২৪ সময়কালে ভারতীয় রেলে ৪১৬৫৫ কিলোমিটার লাইনে বিদ্যুতায়ন হয়েছে। সেখানে স্বাধীনতার পর থেকে ২০১৪ পর্যন্ত ২১৪১৩ কিলোমিটার লাইনে বিদ্যুতায়ন করা সম্ভব হয়েছিল।

২০২৪-২৫ সালে রেলের অপারেটিং রেশিয়োর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ৯৮.২২ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে এই অপারেটিং রেশিয়ো ছিল ৯৮.৬৫ শতাংশ। অপারেটিং রেশিয়ো হলো প্রতি ১০০ টাকা আয় করতে রেল কতটাকা খরচ করে। অপারেটিং রেশিয়ো ১০০ টাকার বেশি হলে বুঝতে হবে রেল ক্ষতিতে চলছে আর ১০০-এর নীচে হলে রেল লাভ করছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে রেলের মোট আয় ছিল ২.৪০ লক্ষ কোটি টাকা আর মোট ব্যয় ছিল ২.২৬ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থাৎ ভারতীয় রেল আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে।

উপরোক্ত তথ্য এবং পরিসংখ্যান একটি বিষয়কে প্রমাণ করে যে ভারতীয় রেল প্রগতির পথে চলেছে। রেল আধুনিক হচ্ছে, রেল ইঞ্জিন এবং কোচগুলো এখন অনেক উন্নতমানের হচ্ছে। এছাড়া রেল এখন দেশের আর্থিক উন্নয়নের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। রেলের এই ভূমিকাকে আরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ২০১৪-২৫ অর্থবর্ষের বাজেটে। এই বাজেটে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন তিনটি প্রধান রেলওয়ে অর্থনৈতিক করিডোর গড়ে তোলার কথা বলেছেন। এর প্রথমটি হলো এনার্জি, মিনারেল এবং সিমেন্ট করিডোর। এই করিডোরে শক্তিসমূহ, খনিজ সম্পদ এবং সিমেন্ট পরিবহণকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। দ্বিতীয়টি হলো পোর্ট কানেক্টিভিটি করিডোর। এই করিডোরের মাধ্যমে প্রধান বন্দরগুলির সঙ্গে দেশের প্রান্ত অঞ্চলগুলিকে যুক্ত করা হবে যাতে পণ্য পরিবহণ তরান্বিত হয়। তৃতীয়টি হলো হাই ট্রাফিক ডেন্সিটি করিডোর। এই করিডোর এমনভাবে তৈরি করা হবে যাতে বিপুল পরিমাণ যাত্রী এবং পণ্য পরিবহণকে সহজ করা যায়। পিএম গতিশক্তি মিশনের অধীনে বহুমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার যে প্রক্রিয়া চলছে সারাদেশে রেলও তাঁর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়ে উঠবে। পিএম গতিশক্তি (যা ২০২১ সালের ১৩ অক্টোবর চালু হয়) হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং স্থিতিশীল উন্নয়নের এক পরিবর্তনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি। আধুনিক গতিশীল জীবনের সঙ্গে তাল রেখে এই মিশনের অধীনে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। পিএম গতিশক্তি মিশনের রুপায়ণকে সুনিশ্চিত করতে রেলের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের জন্য প্রস্তুত করা রেল বাজেট মূলত আধুনিকীকরণ, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং জনগণের বড়ো অংশের কল্যাণার্থে প্রস্তুত হয়েছে। সমাজ বদলের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গিরও বদল আনতে হয়। নতুন ভাবনাকে স্বাগত জানাতে হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের রেল বাজেট সেই নতুন ভাবনারই দিশারী। □

এই বাজেট এবং আমাদের গতিশীল বাজার

শেখর সেনগুপ্ত

কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবার বাজেটে যে ছবি পেশ করেছেন, তা কিন্তু বিত্তের সম্ভাব্য চিত্র দেখিয়ে তাবৎ দেশবাসীর চিত্তজয়ে যথার্থরূপে সফল হতে সময় নেবে। কিন্তু যাঁরা উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত, তাঁদের সন্তুষ্ট হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে এই বাজেট-প্রপোজালে। যেমন ধরুন আয়কর, যেখানে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাপনা অবশ্যই আয়করদাতাদের মুখে হাসি ফোটাবে : *(সারণি দ্রষ্টব্য)*

৭ লক্ষ টাকা অবধি আয়ে রিবেট পাওয়া যাবে। কিন্তু করযোগ্য আয় ৫০ লক্ষ টাকার বেশি হলে প্রদত্ত করের সঙ্গে দিতে হবে ১০ শতাংশ সারচার্জ। আবার বার্ষিক আয় ১ কোটি থেকে ২ কোটির মধ্যে হলে ১৫ শতাংশ সারচার্জ ধার্য হবে। আর আয় যদি ২ কোটিকে অতিক্রম করে এক বছরে, তা হলে সেই সারচার্জ গিয়ে দাঁড়াবে ২৫ শতাংশ। এবারের বাজেটে ক্রীড়াক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে ধার্য হয়েছে ৩,৩৯৭ কোটি টাকা, যা গত বছরের চেয়ে ৪৫ কোটি টাকা বেশি। ভারতের ক্রীড়ামোদীদের জন্য এটি একটি সুখবর।

নতুন আয়কর বিধি মোতাবেক চাকরিজীবীরা নিজ নিজ বেতনে করছাড়ের সুবিধা পাবেন সর্বাধিক ১৭ হাজার ৫০০ টাকা। নির্মলা সীতারামন জানিয়েছেন, 'দেশের গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার এক বছরে ব্যয় করবে ২.৬৬ লক্ষ কোটি টাকা। কৃষিতে উন্নয়নের জন্য রাখা হয়েছে ১.৫২ লক্ষ কোটি টাকা এবং দেশের পরিকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় হবে ১১ লক্ষ ১১ হাজার ১১১ কোটি টাকা। উচ্চশিক্ষার জন্য সরকার এক একজনকে সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা অবধি ঋণ দিতে প্রস্তুত।'

এই ঘোষিত বাজেটের প্রভাবে যে সকল জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি ইতিমধ্যেই ঘটেছে, সেগুলি হলো (১) গবেষণাগারে ব্যবহারযোগ্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি; (২) কিছু টেলিকম সরঞ্জাম; (৩) প্লাস্টিক দ্বারা নির্মিত সামগ্রী; (৪) আমদানি করা ছাতা ইত্যাদি।

এর বিপরীতে যে সকল দ্রব্যাদির দাম কমেছে অথবা কমতে চলেছে, সেগুলি হলো—(১) মোবাইল ফোন, (২) মাছের খাবার, (৩) চামড়ায় তৈরি দ্রব্যাদি, (৪) ফোনের চার্জার, (৫) সোনা, (৬) রুপা, (৭) প্ল্যাটিনাম, (৮) ফেরো নিকেল, (৯) সোলার প্যানেল, (১০) ক্যানসার চিকিৎসায় ব্যবহৃত তিন ধরনের ওষুধ।

অতি সংক্ষেপে এই হলো এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটের রূপরেখা। পরিশেষে জানাতে হয়, কেন্দ্রীয় সরকার চাইছেন দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ। ভারতের বিশাল ইমার্জিং মার্কেট দুনিয়াতে ক্রমেই হয়ে উঠছে অনন্য।

যাঁরা অভিজ্ঞ ও চিন্তাশীল, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁরা ইতিবাচক দিকগুলি ভেবে দেখুন। হয়তো পেতে চলেছেন সুদিনের স্বাদ।

সারণি

২০২৪-'২৫ অর্থ বাজেটে প্রস্তাবিত আয়কর-কাঠামো

বার্ষিক আয়	করের হার যা হয়েছে (%)	যে বার্ষিক আয়কে গণ্য করা হচ্ছে
৩ লক্ষ টাকা অবধি	শূন্য	৩ লক্ষ টাকা
৩ লক্ষ টাকার বেশি, কিন্তু ৬ লক্ষ টাকার বেশি নয়।	৫%	কিন্তু ওই করযোগ্য আয়কে এখানে ধরা হচ্ছে ৭ লক্ষ টাকা।
টাকার অঙ্কে আয় যখন ৬ লক্ষের বেশি, কিন্তু ৯ লক্ষের অধিক নয়।	১০%	করযোগ্য আয়, টাকার অঙ্কে হওয়া চাই ৭ লক্ষের অধিক, কিন্তু ১০ লক্ষ টাকার বেশি নয়।
টাকার অঙ্কে আয় ৯ লক্ষ টাকার অধিক, কিন্তু ১২ লক্ষ টাকার অধিক নয়।	১৫%	কর ধার্য হবে ১০ লক্ষ টাকার অধিক, কিন্তু ১২ লক্ষ টাকার বেশি নয়, এমন উপার্জনের ওপর।
উপার্জন যখন ১২ লক্ষ টাকার অধিক, কিন্তু ১৫ লক্ষ টাকা অতিক্রম করেনি।	২০%	উপার্জন ১২ লক্ষ থেকে শুরু করে ১৫ লক্ষ টাকার মধ্যে থাকা চাই।
উপার্জন যখন ১৫ লক্ষ টাকার অধিক।	৩০%	১৫ লক্ষ টাকার অধিক আয় হতেই হবে।

আগে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ছিল ৫০ হাজার টাকা। নতুন ব্যবস্থায় তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৫ হাজার টাকা। ফ্যামিলি পেনশনের ক্ষেত্রে এই ছাড় ১৫ হাজার থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫ হাজার টাকা।

আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে এবার বাজেটে প্রতিরক্ষায় গুরুত্ব

কর্নেল কুণাল ভট্টাচার্য

২০২৪-'২৫ আর্থিক বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন প্রতিরক্ষা খাতে ৬,২১,৯৪০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করেছেন। ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে ভারতের প্রতিরক্ষা বাজেটের পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ ৯৪ হাজার কোটি টাকা। এই বছর ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাজেট বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ২৭ হাজার কোটি টাকা যা ২০২৩-'২৪ ও ২০২২-'২৩ সালের তুলনায় যথাক্রমে ৪.৭৯ ও ১৮.৪৩ শতাংশ বেশি। বিগত বছরগুলির তুলনায় এই বছর ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাজেট বৃদ্ধি সামরিক বাহিনীর উন্নতি ও প্রতিরক্ষা পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রতি ভারত সরকারের বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার দিকটিকে তুলে ধরে। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভারতের স্ট্র্যাটেজিক ফোকাসের প্রতিফলন এই বছরের প্রতিরক্ষা বাজেট।

২০২৪-'২৫ আর্থিক বছরের বাজেটে ডিফেন্স ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার বা প্রতিরক্ষা খাতে মূলধনী ব্যয়ের পরিমাণ ১ লক্ষ ৭২ হাজার কোটি টাকা ধরা হয়েছে। এই বছরের প্রতিরক্ষা বরাদ্দ মোট বাজেট বরাদ্দের ১২.৯ শতাংশ। এই খাতে বাজেট বরাদ্দ সব ক'টি খাতের মধ্যে সর্বোচ্চ। দেশীয় প্রতিরক্ষা সামগ্রী উৎপাদন শিল্প, নানা এমএসএমই (ছোটো ও মাঝারি প্রতিরক্ষা শিল্প) ও ডিফেন্স স্টার্ট-আপগুলিকে সহায়তার মাধ্যমে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিরক্ষা বাজেটে ১,০৫,৫১৮ কোটি টাকা ডোমেস্টিক ক্যাপিটাল প্রোকিয়োরমেন্ট বাবদ বরাদ্দ হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। প্রতিরক্ষা শিল্প-ভিত্তিক একটি দেশীয় ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে এই অর্থ সহায়ক হবে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

যদিও ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে গত ফেব্রুয়ারিতে পেশ করা অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটের তুলনায় গত ২৩ জুলাই পেশ হওয়া পূর্ণাঙ্গ বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতের বরাদ্দে বড়ো কোনো পরিবর্তন হয়নি। দুইটি বাজেটেই প্রতিরক্ষা বরাদ্দের পরিমাণ প্রায় সমান। গত ফেব্রুয়ারিতে প্রতিরক্ষা ব্যয়ের জন্য ৬,২১,৫৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। জুলাই মাসের পূর্ণাঙ্গ বাজেটে যা দাঁড়িয়েছে ৬,২১,৯৪০ কোটি টাকায়, অর্থাৎ অন্তর্বর্তী বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ৪০০ কোটি টাকা বেশি।

অন্তর্বর্তী বাজেটে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৪৫.০৩ লক্ষ কোটি টাকা। প্রতিরক্ষা বাজেট ছিল মোট সরকারি ব্যয়ের ১৩.২ শতাংশ। পূর্ণাঙ্গ বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট প্রস্তাবিত ব্যয় বরাদ্দ দাঁড়িয়েছে ৪৮.০২ লক্ষ কোটি টাকা। প্রতিরক্ষা বরাদ্দ মোট ব্যয়ের ১২.৯ শতাংশ।

প্রতিরক্ষা খাতে ১ লক্ষ ৭২ হাজার কোটি টাকার মূলধনী ব্যয় ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করবে। ডোমেস্টিক ক্যাপিটাল প্রোকিয়োরমেন্ট (অভ্যন্তরীণ মূলধন সংগ্রহ) বাবদ নির্ধারিত অর্থের পরিমাণ ১.০৫ লক্ষ কোটি টাকা। প্রতিরক্ষা খাতে মূলধনী ব্যয় ও ভারতীয় প্রতিরক্ষা শিল্পের বিকাশে বরাদ্দ অর্থ প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে ভারতের যাত্রায় গতিসঞ্চার করবে বলে জানিয়েছেন রাজনাথ সিংহ।

এই বাজেটে বর্ডার রোডস্ অর্গানাইজেশন (বিআরও)-এর জন্য বরাদ্দ অর্থেরও বৃদ্ধি ঘটেছে। মূলধনী ব্যয়ের খাতে বিআরও-র জন্য বরাদ্দ অর্থে প্রতিরক্ষা পরিকাঠামো নির্মাণ ও পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ মূলত হয়ে থাকে। এই খাতে গত বাজেটের তুলনায় ৩০ শতাংশ বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বছর কেন্দ্রীয় বাজেটে বর্ডার রোডস্ অর্গানাইজেশনের জন্য ৬,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০২৩-'২৪ ও ২০২১-'২০২২ অর্থবর্ষের বরাদ্দের তুলনায় এই আর্থিক বছরে বিআরও-র জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে ৩০ শতাংশ ও ১৬০ শতাংশ। এই প্রসঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন যে বিআরওতে ৬,৫০০ কোটি টাকার আর্থিক বরাদ্দ ভারতের সীমান্ত পরিকাঠামো উন্নয়নকে আরও ত্বরান্বিত করবে। লাদাখের নিওমা এয়ারফিল্ড এবং হিমাচল প্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলে টানেল তৈরির মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি রূপায়ণে বিআরও তার এই তহবিল ব্যবহার করবে। প্রতিরক্ষা শিল্পে ভারতীয় স্টার্ট-আপ ভিত্তিক ইকোসিস্টেমের অগ্রগতি-সহ বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেওয়া ব্যক্তি বা ছোটো খাটো উদ্যোগগুলির দ্বারা বেসিক টেকনোজিকাল সলিউশন্সের প্রস্তুতি ও উপস্থাপনায় আর্থিক সহযোগিতার জন্য iDEX (ইনোভেশন্স ফর ডিফেন্স এক্সেলেন্স) প্রকল্পে ৫১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানিয়েছেন। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে এই অর্থায়ন

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

এবার বাজেটের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো 'অগ্নিবীর' প্রকল্পের জন্য বর্ধিত আর্থিক বরাদ্দ। ২০২২-'২৩ সালে এই প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ১৫৯.৫৯ কোটি টাকা। ২০২৪-'২৫-এর অন্তর্বর্তী বাজেটে যা বেড়ে দাঁড়ায় ২,৮৩৬ কোটি টাকায়। গত জুলাইয়ের পূর্ণাঙ্গ বাজেটে এই প্রকল্পে ৫,২০৭.২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তিন বাহিনীর জন্য মূলধনী বরাদ্দ (capital allocations) একই রয়েছে। তার মধ্যে সেনাবাহিনী ৩৩,৪১১ কোটি টাকা, নৌবাহিনী ৫১,০৫২ কোটি ও বিমান বাহিনী সবচেয়ে বেশি ৫৮,১১২ কোটি টাকা পেয়েছে।

এবারের বাজেটে ব্যয় খাতে বরাদ্দকৃত মোট অর্থের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মূলধনী ব্যয় খাতে বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক। অনুরূপভাবেই প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও প্রস্তাবিত মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধি ঘটেছে, যার ফলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও প্রতিরক্ষা পরিকাঠামোয় প্রভূত উন্নতি ঘটবে। সংবাদসূত্রের খবর, এর মধ্যে নতুন অস্ত্র ও ডিফেন্স সিস্টেম যেমন ফাইটার এয়ারক্র্যাফ্ট, যুদ্ধজাহাজ, সাবমেরিন, মনুষ্যবিহীন আকাশযান (আনম্যানড্ এরিয়াল ভেহিকল্), সাঁজোয়া গাড়ি ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অন্যান্য যানবাহন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ভারতীয় প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে এই অত্যাধুনিক প্রতিরক্ষা সামগ্রীসমূহের অন্তর্ভুক্তি ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতি সাধন করবে।

ডিফেন্স রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার বা প্রতিরক্ষা খাতে রাজস্ব ব্যয়ের মধ্যে সাস্টেন্যান্স অ্যান্ড অপারেশনাল প্রিপেয়ার্ডনেস বা সামরিক প্রস্তুতির জন্য প্রতিরক্ষা রাজস্ব ব্যয়ের ১৪.৮২ শতাংশ বরাদ্দ হয়েছে। প্রতিরক্ষা খাতের রাজস্ব ব্যয়ের ৩০.৬৮ শতাংশ অর্থ বেতন ও ভাতা বাবদ বরাদ্দ করা হয়েছে। এই রাজস্ব ব্যয়ের ২২.৭২ শতাংশ অর্থ প্রতিরক্ষা পেনশন খাতে বরাদ্দ হয়েছে। এ বছর কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রতিরক্ষা পেনশনের পরিমাণ বেড়ে ১.৪১ লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। গত আর্থিক বছরের তুলনায় প্রতিরক্ষা পেনশন ২.১৭ শতাংশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনস্থ অসামরিক সংস্থাগুলির জন্য প্রতিরক্ষা রাজস্ব ব্যয়ের ৪.১১ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে সাস্টেন্যান্স অ্যান্ড অপারেশনাল কমিটমেন্ট খাতে ৯২,০৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এটি গত আর্থিক বছরের তুলনায় ৪৮ শতাংশ বেশি। আমদানি কমিয়ে ভারতীয় সংস্থাগুলির থেকে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কেনার জন্য ১.০৫ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ১.০৫ লক্ষ কোটি টাকার এই মর্ডানাইজেশন বাজেট প্রতিরক্ষা খাতে মোট মূলধনী ব্যয়ের ৭৫ শতাংশ। এই অর্থে ভারতীয় প্রতিরক্ষা সামগ্রী উৎপাদনকারীদের থেকে সংগৃহীত প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম দেশীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক আধুনিকীকরণে সহায়ক হবে।

এই বাজেটে প্রাক্তন সৈনিকদের জন্য স্বাস্থ্য প্রকল্পে (এক্স-সার্ভিসমেন কন্ট্রিবিউটরি হেলথ্ স্কিম বা ইসিএইচএস) বরাদ্দ বাড়িয়ে ৬,৯৬৮ কোটি টাকা করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত এই অর্থের পরিমাণ আগের অর্থবছরের তুলনায় ২৮ শতাংশ বেশি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রককে ৬,২১,৯৪০.৮৫ কোটি টাকার সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ দেওয়ার জন্য প্রতিরক্ষামন্ত্রী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তাঁর এক্স-হ্যান্ডেলে রাজনাথ সিংহ লিখেছেন যে ২০২৪ সালের প্রতিরক্ষা বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ মোট বাজেট ব্যয়ের ১২.৯ শতাংশ। তার সঙ্গে ১,৭২,০০০ কোটি টাকার মূলধন সশস্ত্র বাহিনীর আরও ক্ষমতাবৃদ্ধি করবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন হলো বৃহত্তম শক্তি। প্রতিরক্ষা খাতে চীন যা ব্যয় করে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বরাদ্দ তার এক-তৃতীয়াংশেরও কম। এ বছর ভারত সরকার কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রতিরক্ষা ব্যয়ের জন্য ৬.২১ লক্ষ কোটি টাকা (প্রায় ৭৫ বিলিয়ন ডলার) বরাদ্দ করেছে যা ২০২৩ সালে তাদের বরাদ্দ ৫.৯৪ লক্ষ কোটি (৭২.৬ বিলিয়ন ডলার) অপেক্ষা বেশি। চীন ঘোষণা করেছে যে ২০২৪ সালে প্রতিরক্ষা খাতে তারা ২৩১ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করবে। যদিও বিশেষজ্ঞদের অভিমত যে বেইজিং সম্ভবত তার প্রতিরক্ষা ব্যয় অনেক কমিয়ে দেখাচ্ছে এবং আসল অঙ্কটি তাদের ঘোষিত ব্যয়ের প্রায় তিনগুণ হতে পারে। আমেরিকা গত বছর প্রতিরক্ষা খাতে ৮৫৮ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। ২০২২ সালে স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট হতে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের এই দুই বৃহত্তম শক্তি বিশ্বের মোট প্রতিরক্ষা ব্যয়ের অর্ধেকেরও বেশি খরচ করে।

এই প্রতিবেদনে রাশিয়াকে তৃতীয় স্থানে রেখে প্রতিরক্ষা ব্যয়ের নিরিখে ভারতকে চতুর্থ স্থানে রাখা হয়েছে। ভারতের পশ্চিম ও উত্তর সীমান্তের স্থিতিশীলতা অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তান ও চীনের কারণে ক্ষুণ্ণ হতে পারে। এছাড়াও ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে ক্রমাগত সামরিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়ে চলেছে। এইসব কিছুর প্রেক্ষিতে ২০২৪-'২৫ আর্থিক বছরের ভারতীয় বাজেটে সর্বোচ্চ প্রতিরক্ষা বরাদ্দ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ■

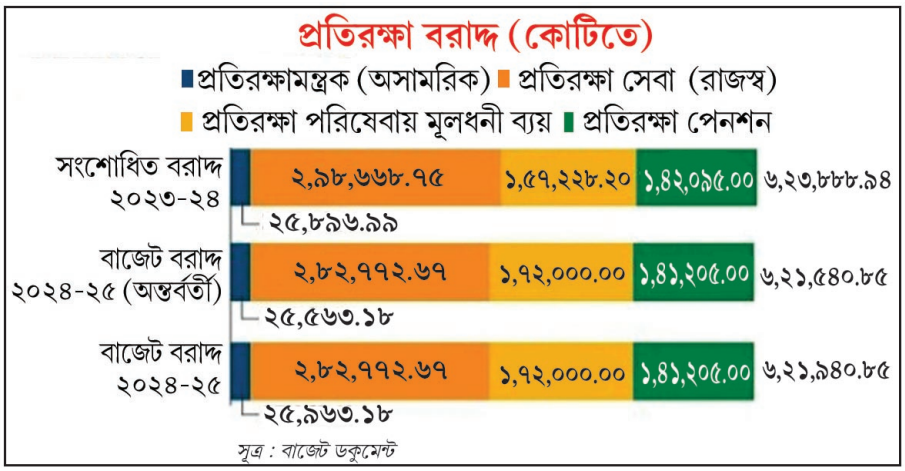

সূত্র : বাজেট ডকুমেন্ট

বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে

ড. পঙ্কজ কুমার রায়

তৃতীয় মোদী সরকারের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের জন্য প্রথম বাজেট পেশ করলেন। প্রকৃত অর্থে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যে সংস্কার ও উন্নয়নের মেলবন্ধনে একটি ইনক্লুসিভ বাজেট উপহার দিলেন। ১৯৪৭ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী আর কে ষন্মুখম চেট্টি স্বাধীন ভারতের প্রথম বাজেট পেশ করেন। ভারতীয় গণতন্ত্রের ৭৫ বছর অতিক্রান্ত হবার পর ২০২৪ সালের ২৩ জুলাই মোদী সরকারের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ সপ্তমবারের জন্য কেন্দ্রীয় বাজেট পার্লামেন্টে পেশ করেন। এই বাজেট ২০৪৭ ভারতীয় গণতন্ত্রের শতবর্ষের বিকশিত ভারতের অভিমুখে সুদূরদর্শী বাজেট বলা যেতে পারে। উল্লেখ্য, এনডিএ সরকারের প্রতিটি বাজেটেই এক ধারাবাহিকতা রয়েছে।

২০২৪-২০২৫ অর্থবর্ষের বাজেট পরিকাঠামো, মহিলাদের দক্ষতার উন্নয়ন, যুবকদের কর্মসংস্থান, শিক্ষার সঙ্গে প্রযুক্তির যুক্তকরণের মাধ্যমে উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান, গ্রাম উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন ও জনকল্যাণকর প্রকল্পের সংমিশ্রণ। শিক্ষাকে উন্নয়নের সঙ্গে জুড়তে দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ভারতীয় অর্থনীতিতে উৎপাদনের সঙ্গে ইনসেন্টিভের যোগসূত্র আবহমান বজায় ছিল। কর্মসংস্থানকে নিশ্চিত করতে শিক্ষা ও শিল্পের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সরকার প্রারম্ভে ইনসেন্টিভের ব্যবস্থা এগিয়ে এসেছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি হলো পরিকাঠামো উন্নয়ন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের বড়ো উৎস পরিকাঠামো নির্মাণ। চলতি আর্থিক বছরে রেকর্ড পরিমাণ অর্থ ১১.১১ লক্ষ কোটি টাকা পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। বিশ্বের জনবহুল দেশের আর্থিক বৃদ্ধি বজায় রাখা এবং কর্মসংস্থানের প্রবাহ বজায় রাখতে পরিকাঠামো উন্নয়নকে চিহ্নিত করেছেন অর্থমন্ত্রী। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ ছিল জিডিপি ১.৭ শতাংশ তা ২০২৪-২০২৫ অর্থবর্ষে বেড়ে দাঁড়িয়েছে জিডিপি ৩.৪ শতাংশ অর্থাৎ পাঁচ বছরে দ্বিগুণ। গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নে ২.৬৬ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় দেশের ৬ লক্ষ গ্রামের মধ্যে ২৫ হাজার গ্রামকে যুক্ত করার প্রয়াস নেওয়া হবে। পরিকাঠামোর সঙ্গে জোর দেওয়া হয়েছে পর্যটনের মাধ্যমে ভারত আত্মার সংযোগ। গয়ার বিষ্ণুমন্দির, বুদ্ধের বোধিপ্রাপ্তি স্থান বুদ্ধগয়া, প্রাচীন মগধের রাজধানী রাজগীর ও প্রাচীন জ্ঞানপীঠ নালন্দাকে যুক্ত করার প্রয়াস হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন তীর্থক্ষেত্রগুলিকে পর্যটনের বিশ্বমানচিত্রে স্থান করে দেওয়া। শুধু কি তাই? চলতি আর্থিক বছরে রাজ্যগুলিকে ১.৫ লক্ষ কোটি টাকার দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেবার কথা ঘোষণা করা হয়েছে এই বাজেটে।

সড়ক পরিবহণে বরাদ্দ ২.৭২ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২.৭৮ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে। অন্যদিকে, রেল পরিবহণে বরাদ্দ ২.৫২ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২.৫৬ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে। রেলের সুরক্ষায় ১.০৮ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কবি সুভাষ থেকে বিমান বন্দর পর্যন্ত, মেট্রো অরেঞ্জ লাইনের জন্য বরাদ্দ ১৭০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ১,৭৯১ কোটি টাকা। জোকা-বিবিডি বাগ পার্সেল লাইনের জন্য বরাদ্দ ৮৫০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,২০৮.৬০ কোটি টাকা। নোয়াপাড়া থেকে বিমান বন্দরের কাজ প্রায় শেষের পথে তাই বরাদ্দ করা হয়েছে ৫০ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গে রেলখাতে চলতি বছরের বরাদ্দ ১৩,৯৪১ কোটি টাকা, যা ইউপিএ আমলে বরাদ্দ ৪,৩৮০ কোটি টাকার প্রায় তিনগুণ। পশ্চিমবঙ্গে রেল প্রকল্পের কাজ অধিকাংশ জমিজটে আটকে আছে। রাজ্য সরকারকে এক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা পালন করতে হবে। গত দশ বছরে রেলে সারা দেশে প্রায় পাঁচ লক্ষ নিয়োগ হয়েছে। কেবলমাত্র গত বছরে নিয়োগ হয়েছে প্রায় এক লক্ষ। বিহারের জন্য সড়ক সংযোগ যোজনায় ২৬,০০০ কোটি টাকার প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া, প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার বরাদ্দ ১৬,১০০ কোটি টাকা করা হয়েছে।

কৃষিতে বরাদ্দ ১.৫২ লক্ষ কোটি টাকা, বিগত বছরের তুলনায় ২০ শতাংশ বেশি। তেষট্টি হাজার গ্রামে পাঁচ কোটি জনজাতির জন্য চালু হচ্ছে 'প্রধানমন্ত্রী জনজাতি উন্নত গ্রাম অভিযান'। পিএম ফসল বিমা যোজনার বরাদ্দ ১৪,০০০ কোটি টাকা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। মনরেগার বরাদ্দ ৬০,০০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৮৬,০০০ কোটি টাকা হয়েছে, ফলে মাথাপিছু দৈনিক আয় ২৮৯.৭৯ টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ৩১১.১৩ টাকা। কৃষি সিঁচাইয়ে বরাদ্দ ৮৭৮১ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৯,৩৩৯ কোটি টাকা করা হয়েছে। কৃষি বিকাশ যোজনায় বরাদ্দ ৬,১৫০ কোটি টাকা থেকে ৭,৫৫৩ কোটি টাকা হয়েছে। পিএম ফসল বিমা যোজনায় ১৪,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্র (এমএসএমই)-কে ভারতীয় অর্থনীতির অক্সিজেন বলা হয়। ভারতীয় অর্থনীতির ২৯ শতাংশ এমএসএমই-র অবদান। রপ্তানির ক্ষেত্রে এমএসএমই-র অবদান ৫০ শতাংশ এবং সংগঠিত ক্ষেত্রের মোট কর্মসংস্থানের ৪৫ শতাংশ এই ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। কর্মসংস্থানে এমএসএমই-র অবদান কৃষির পরেই, কর্মসংস্থান প্রায় ১১-১০ কোটি।

সেবাক্ষেত্র ভারতীয় অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান অবদান রেখে চলেছে। আইটি ও টেলিকমের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আইটি ও টেলিকম সেক্টরের বরাদ্দ ১,১৫,৭৫২ কোটি টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,২৮,১০০ কোটি টাকা। প্রচলিত ও অপ্রচলিত শক্তিতে অর্থবরাদ্দ ৬২, ৩৫৮ কোটি টাকা, যার ১৫ শতাংশ সৌরশক্তিতে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ১ কোটি বাড়িতে সৌরশক্তিতে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ১ কোটি বাড়িতে সৌরচালিত বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হবে এবং

এবারের বাজেট

ব্যবহারকারী ৩০০ ইউনিট বিদ্যুৎ বিনা ব্যয়ে ব্যবহার করতে পারবে। অপ্রচলিত শক্তি ক্ষেত্রে বরাদ্দ ১৯,১০০ কোটি টাকা করা হয়েছে।

শিক্ষা ও দক্ষতায় বরাদ্দ ১.৪৮ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করতে ও শিক্ষার সঙ্গে স্কিলের সমন্বয় ঘটাতে ৫ বছরে ১ কোটি যুবককে ৫০০টি শীর্ষ সংস্থায় ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থার মাধ্যমে এক বিরাট কর্মযজ্ঞ আয়োজন করা হয়েছে। সমগ্র শিক্ষা অভিযানে ৩৭,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। ভাষা অনুবাদে ৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এনইপি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় শিক্ষাদানকে তরান্বিত করতে। এছাড়াও স্কিল ইন্ডিয়া মিশনের বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩,৫২৪ কোটি টাকা। উচ্চশিক্ষার পড়ুয়াদের ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ৩ শতাংশ হারে শিক্ষাঋণ দেবার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৯০,৯৫৮.৬৩ কোটি টাকা, যা ২০২০-২০২৪ অর্থবর্ষে ছিল ৮০,৫১৭.৬২ কোটি টাকা। যার মধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণে ধার্য করা হয়েছে ৮৭,৬৫৬.৯০ কোটি টাকা (এর মধ্যে আয়ুষ ৩৭১২.৪৯ কোটি টাকা) এবং স্বাস্থ্য গবেষণায় ৩,৩০১.৭৩ কোটি টাকা। ক্যানসারের তিনটি জীবনদায়ী ওষুধের ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক তুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে ক্যানসার রোগের ওষুধের দাম অনেকটাই কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে বরাদ্দ ৪,১০৮ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭,৩০০ কোটি টাকা দাঁড়িয়েছে। ন্যাশনাল লাইভলিহুড মিশনের বরাদ্দ ১৪,৬৫২ কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ১৫,৪০৮ কোটি টাকা।

মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়নে ৩.৩৯ লক্ষ কোটি টাকা বর্তমান আর্থিক বছরে বরাদ্দ করা হয়েছে যা পূর্ববর্তী আর্থিক বছরে ছিল ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা। মহিলাদের সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প ডিউটি কমানো হবে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় আরও ৩ কোটি বাড়ি তৈরির ব্যবস্থা করা হবে। শহরে গরিব ও মধ্যবিত্ত আবাস যোজনায় প্রতি বছর ২.২ লক্ষ কোটি অর্থাৎ পাঁচ বছরে ১০ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দের মাধ্যমে নিম্ন ও মধ্যবিত্তের আয়ত্তের মধ্যে আবাসের ব্যবস্থা করা হবে। আবাস যোজনায় হোমলোনের ভরতুকি। এর জন্য ৩০০০ কোটি টাকা এবং এমআইজির জন্য গত বছরে ১,০০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ১০০টির বেশি স্মার্ট সিটির জন্য বরাদ্দ ৭,৭১৮ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮১৭২৮ কোটি টাকা করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন শহর ও গ্রামাঞ্চলে সিমেন্ট, বালি, স্টিল ও বাড়ি তৈরির সরঞ্জামের চাহিদা বাড়বে, অন্যদিকে ইঞ্জিনিয়ার থেকে শ্রমিকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। কেন্দ্রীয় আবাস ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রকের বরাদ্দ ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৮ শতাংশ বৃদ্ধি করে ৮২,৫৭৬.৫৭ কোটি টাকা করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার বরাদ্দ ৬১.১৬৯ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। জলজীবন মিশনের বরাদ্দ ৭০, ১৬৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তপশিলি উপজাতিদের উন্নয়নের বরাদ্দ ৩,২৮৬ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪,৩৪৭ কোটি টাকা, তপশিলি জাতির উন্নয়নে বরাদ্দ ৬,৭৮০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৯,১৯১ কোটি টাকা করা হয়েছে।

মধ্যবিত্তদের কথা মাথায় রেখে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ৫০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৭৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। নাবালকদের জন্য এনপিএস-এ নতুন বাৎসল্য যোজনা চালুর প্রস্তাব এই বাজেটে রাখা হয়েছে। মূলধনী লাভের ওপর কর ছাড় ১ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১.২৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের বিনিয়োগকারীদের স্বল্প মেয়াদি মূলধনী লাভের ক্ষেত্রে করের হার ১৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২০ শতাংশ করা হয়েছে এবং দীর্ঘমেয়াদি মূলধনী লাভে করের হার ১০ শতাংশ থেকে ১২.৫ শতাংশ করা হয়েছে। মূলধনী ব্যয় অর্থনীতিতে গতির সঞ্চার করে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে মূলধনী ব্যয় ১১.১১ লক্ষ কোটি টাকা ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬.০১ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে। যেহেতু সরকারি ব্যাংক ও সরকারি সংস্থা থেকে লভ্যাংশ বাবদ ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে আয় হয়েছে প্রায় ১.৫ লক্ষ কোটি টাকা সেই কারণে বিলগ্নিকরণ থেকে আয় না বাড়িয়ে ৫১,০০০ কোটি টাকাই রাখা হয়েছে।

আগামী ৫ বছর প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্নযোজনা চালু থাকবে। এই খাতে বরাদ্দ ৫৫, ৩২১ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৭,৫২৫ কোটি টাকা করা হয়েছে। বাজেটে আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। ফিসক্যাল ডেফিসিট ৬.৪ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়াবে ৪.৯ শতাংশ এবং ভবিষ্যতে ৪.৫ শতাংশে নামিয়ে আনার প্রয়াস করা হবে। অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসু বলেছেন, বাজেট মোটের ওপর ভালো। জিডিপি গ্রোথ পৃথিবীর উন্নত দেশের তুলনায় অনেক ভালো। ইকনমিক সার্ভেও পজিটিভ দিশা দেখিয়েছে। বিশ্বব্যাপী মন্দার পরিস্থিতিতেও ভারতের অর্থনীতি আশার সঞ্চার করছে।

ফঃ ৪

২০২৪-’২৫ কেন্দ্রীয় অর্থ বাজেটে পরিকাঠামো উন্নয়নগত ব্যয়বরাদ্দ

সুদীপ্ত গুহ

লুব্রিক্যান্ট যেমন যন্ত্রের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে, এনজাইম যেমন খাবার হজমের ক্ষমতা বাড়ায়, অনুঘটক যেমন রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি নিয়ন্ত্রণ করে, অ্যাডমিক্সচার যেমন কংক্রিটের সেটিং সময় এবং কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি পরিকাঠামো একটি দেশের আর্থিক এবং বাণিজ্যিক প্রতিটি সূচককে প্রভাবিত করে বৃদ্ধি করে দেশবাসীর আয়। এই খাতে বিনিয়োগ সৃষ্টি করে প্রচুর কর্মসংস্থান। রিজার্ভ ব্যাংকের একটি সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, গত তিন আর্থিক বর্ষে আমাদের বাজেটে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার দ্বিগুণ হওয়ায় আমাদের দেশের ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে নতুন কর্মসংস্থান যোগ হয়েছে ৪.৬ কোটি। এই ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার হয়েছে সড়ক নির্মাণ, রেলপথ (যাত্রীবাহী, মালবাহী ও মেট্রো), জলপথ, বিমানপথ, বন্দর, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিদ্যুৎ পরিবহণ, বিদ্যুৎ বণ্টন, সেচ, সেতু, নদীবাঁধ, বাসস্থান, জলবিদ্যুৎ, সৌরবিদ্যুৎ, মিনিগ্রিড, পানীয় জল, পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি প্রায় সব ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়েছে উচ্চপ্রযুক্তি। পুরো পরিবহণ ব্যবস্থাকে এমনভাবে ঢেলে সাজানো হচ্ছে, যাতে সবচেয়ে কম সময়ে ও খরচে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো যায়, কাঁচামাল কম সময়ে উৎপাদন কেন্দ্রে আনা যায়, শক্তি অপচয় কমিয়ে বিদেশ থেকে তেল আমদানি কমিয়ে বিদেশি মুদ্রাভাণ্ডার বাঁচানো যায়। উপরোক্ত ক্ষেত্র ছাড়াও, বিনিয়োগ হয়েছে টেলিকম, প্রতিরক্ষা ও মহাকাশ পরিকাঠামোতেও।

কিন্তু লক্ষ্য কী? কোন রাসায়নিক ক্রিয়ার জন্য এই অনুঘটক নির্মাণ? গন্তব্য কোথায়?

১. কর্মসংস্থান ২.আত্মনির্ভর ভারত ৩. ২০৪৭-এর মধ্যে সুপারপাওয়ার হওয়া। এই তিনটি লক্ষ্য পূরণের জন্য যা প্রয়োজন তা হলো কম করে গড়ে আগামী ২৫ বছরে ৭ থেকে ১০ শতাংশ হারে দেশের জিডিপি তথা উৎপাদন বৃদ্ধি ও রপ্তানি। কারণ বৃদ্ধি না হলে কর্মসংস্থান হবে না। ১৯৯১ সালে ভারতীয় অর্থনীতি না ছিল রপ্তানি বা পরিষেবা নির্ভর, না ছিল পণ্য উৎপাদনে স্বনির্ভর। হলেও সেটা ছিল একটা ছোটো অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ১৯৯১ থেকে আসে মুক্তবাজার অর্থনীতি, কিন্তু সেটা সীমাবদ্ধ থাকে পরিষেবাতে। দেশে বাড়তে থাকে টিসিএস, ইনফোসিস, উইপ্রোর মতো কোম্পানি।

কিন্তু উৎপাদন? দেশ বছর বছর ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করছে, কিন্তু তৈরি করে না চিপ, মোবাইল, টিভি বা কম্পিউটার। দেশ কোটি কোটি টাকা খরচা করে বছর বছর মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার, ডিপ্লোমা

পাশ করাচ্ছে কিন্তু স্টিল প্লান্ট, বয়লার থেকে অন্যান্য মেশিন আসে বিদেশ থেকে। এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করছে অথচ বিমান কিনি বিদেশ থেকে, নাভাল আর্কিটেকচার পাশ করে জাহাজ বিদেশ থেকে আমদানি হয়। বড়ো বড়ো মাইনিং কোম্পানি অথচ চীন বা আমেরিকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খনিজ সম্পদ খুঁজি না। চীন থেকে আসে অধিকাংশ পণ্য, এমনকী বেনারসি শাড়ি বা দীপাবলির প্রদীপও। ৬০ শতাংশ খাবার তেল আসে বিদেশ থেকে, ওষুধ তৈরির কাঁচামাল আসে চীন থেকে, চিপ আসে চীন থেকে, এমনকী আমাদের বস্ত্র ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশ থেকে বস্ত্র তৈরি করে পাঠাচ্ছে পশ্চিমি দুনিয়ায়। ২০১৪ থেকে এই অবস্থার পরিবর্তনের একের পর এক সংস্কার আনা হয়েছে। দেশের ৫০ কোটি মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা, তাঁদের বিমা পরিষেবায় নিয়ে আসা, দেড় ডজন পরোক্ষ কর তুলে দিয়ে একটা জিএসটি আনা, ব্যাংকের হাতে আরও ক্ষমতা দিয়ে আইবিসি আনা, শ্রম আইনে পরিবর্তন, কর ব্যবস্থায় সরলীকরণ ইত্যাদি ৭০০ সংস্কার আনা হয়েছে যার ফল পেয়েছে গত দশ বছর।

এই লক্ষ্য পূরণে গত চার বছরে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে খরচ ১২২ শতাংশ বাড়িয়ে বর্তমান অর্থবর্ষে ১১ লক্ষ ১১ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। বিনিয়োগ হয়েছে সড়ক, রেল, পণ্যবাহী রেল, মেট্রো রেল, নগরোন্নয়ন, গ্রামীণ সড়ক, জলপথ, বিমানবন্দর, বন্দর এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে উচ্চপ্রযুক্তির মাধ্যমে আধুনিকীকরণ। এছাড়াও রাজ্যগুলিকে দেড় লক্ষ কোটি টাকা দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেওয়া হচ্ছে বিনা সুদে। রেলমন্ত্রকে বরাদ্দ হয়েছে ২.৫২ লক্ষ কোটি যার মধ্যে ১.০৮ কোটি রেল সুরক্ষা, সিগন্যাল সিস্টেম এবং ট্রাক পরিবর্তন ইত্যাদি ক্ষেত্রে। এছাড়া আছে রেলব্রিজ, ইলেকট্রিফিকেশন, ডাবল লাইন, পণ্যবাহী রেল করিডোর ও ডিজিটাইজেশন।

সড়কমন্ত্রকে বরাদ্দ ২.৭২ লক্ষ কোটি। এর মধ্যে সড়ক সম্প্রাসরণ ছাড়াও ইলেকট্রনিক্স পরিকাঠামো রয়েছে। জাহাজ মন্ত্রককে দেওয়া হয়েছে ১০০০ কোটি। এই বছর ভারত সরকার ১০০০ জাহাজ তৈরির পরিকল্পনা করেছে। এর জন্য প্রয়োজন সঠিক

পরিকাঠামো। আবাস ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রককে ১.৭২ লক্ষ কোটি বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে স্মার্ট সিটি, মেট্রো রেল, আবাসন ইত্যাদি। এছাড়াও ২.৬৬ লক্ষ কোটি গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রককে বরাদ্দ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আছে গ্রামীণ সড়ক, আবাস যোজনা, হিমঘর, ক্ষুদ্র সেচ ইত্যাদি।

এছাড়া সরকারি পরিকল্পনায় রয়েছে বিভিন্ন শিল্প করিডোর। এই বছর দুইটি নতুন শিল্প করিডোর যোগ করা হয়েছে। পরিকাঠামো উন্নয়নের ফলে দেশে আসছে বিভিন্ন উৎপাদন শিল্প যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ওষুধ, সেমিকন্ডাক্টর, অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী, প্রতিরক্ষা, মহাকাশ ইত্যাদি। এছাড়াও সড়ক, রেল ইত্যাদি পরিকাঠামো উন্নতি হওয়ায় মানুষ কাজ পাচ্ছে কৃষি, মৎস্যচাষ, গোপালন ইত্যাদি ব্যবসায়। তাছাড়া পরিকাঠামো বিনিয়োগ উৎসাহ দেয় স্টিল, সিমেন্ট, বালি, পাথর ব্যবসায়। আর এর ফলে রিজার্ভ ব্যাংকের সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী ২০২৩-২৪-এ আমাদের দেশে ৪.৬ কোটি নতুন মানুষ কাজ পেয়েছে। এই বছর কেন্দ্র আরও বৃদ্ধি করেছে বিনিয়োগ বরাদ্দ। লক্ষ্য হলো পণ্য ও পরিষেবা দুই ক্ষেত্রেই উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি করে আপাতত পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে প্রবেশ। সঙ্গে সাধারণ ভারতের আরও বেশি আয় এবং খরচের ক্ষমতা বৃদ্ধি। কিন্তু এর জন্য আমাদের উৎপাদন খরচ আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে কম হতে হবে। সেটা কম করতে গেলে কাঁচামাল ও জ্বালানি পরিবহণ খরচ এবং পরিবহণ সময় কম করতে হবে। কমাতে হবে উৎপাদিত পণ্য পরিবহণ সময় এবং খরচ। সেইজন্য চাই উন্নত পরিকাঠামো— ভালো সড়ক, পণ্যবাহী রেল, জলপথ, উন্নত বন্দর, সুলভে বিদ্যুৎ ও জল। একই শর্ত কৃষি ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সেই লক্ষ্য নিয়েই প্রতিবছরের মতো এই বছরও বৃদ্ধি করা হয়েছে পরিকাঠামো নির্মাণের বরাদ্দ।

মূলধনী ব্যয় (বাজেট বরাদ্দ— কোটিতে)

মন্ত্রক	২০২৩-২৪ বাজেট বরাদ্দ	২০২৩-২৪ সংশোধিত বরাদ্দ	২০২৪-২৫ বাজেট বরাদ্দ (অন্তর্বর্তী)	২০২৪-২৫ বাজেট বরাদ্দ
রেল মন্ত্রক	২৪০,০০০	২৪০,০০০	২৫২,০০০	২৫২,০০০
সড়ক পরিবহণ	২৫৮,৬০৫	২৬৪,৫২৫	২৭২,২৪১	২৭২,২৪১
জাহাজ মন্ত্রক	১,০৬৮	১,১৬৬	১,০৭৭	১,০৭৭
নগরোন্নয়ন মন্ত্রক	২৫,৯৯৭	২৬,৫৩৩	২৮,৬২৬	২৮,৬২৮
প্রতিরক্ষা মন্ত্রক	১৬২,৬০০	১৫৭,২২৮	১৭২,০০০	১৭২,০০০

উন্নততর পরিকাঠামো দেশের পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদন বৃদ্ধি করবে গুণোত্তর প্রগতিতে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নততর জীবন ও জীবিকা নিশ্চিত করবে এই উন্নয়ন। ভারতকে বিশ্বশক্তিতে পরিণত করার লক্ষ্যে এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট। ■

এবারের বাজেটে নারী ক্ষমতায়ন

আনন্দ মোহন দাস

গত ২৩ জুলাই সংসদে তৃতীয় দফায় মোদী সরকারের প্রথম বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। ভারতের ১৪০ কোটি জনসংখ্যার অর্ধেক হলেন মহিলা। সুতরাং নারী ক্ষমতায়ন না হলে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। সেজন্য অর্থমন্ত্রী এবারের বাজেটে নারী ক্ষমতায়নে কয়েকটি প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন।

চাকরিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে কর্মরত মহিলাদের হোস্টেল, ক্রেশ তৈরির প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে। পাশাপাশি রাজ্যগুলির কাছে আবাসন ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য স্ট্যাম্প ডিউটির হারে কিছু ছাড় দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করেছেন। বস্তুত মহিলারা সম্পত্তি ক্রয় করলে স্ট্যাম্প ডিউটি আরও কিছু কমানোর প্রস্তাব বাজেটে দেওয়া হয়েছে। বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছে, মহিলারা ৭.৫ শতাংশ সুদে দু' বছরের জন্য ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জমা রাখতে পারবেন। মহিলাদের স্ব-নির্ভর প্রকল্পে উৎসাহ দিয়ে বিশেষ দক্ষতা নির্মাণে সাহায্য করার বাজেট প্রস্তাব রয়েছে।

রাজ্যের সঙ্গে সমন্বয় করে আগামী পাঁচ বছরে ২০ লক্ষ তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণে আর্থিক সাহায্য দেবে সরকার। শিক্ষা ঋণের সুদে ৩ শতাংশ হারে ভরতুকি দেওয়া হবে।

এবারের বাজেটে বেকারত্ব দূরীকরণে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং যে সমস্ত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বাড়বে, সেইসব ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাজেট প্রস্তাবে ৫০০টি বৃহৎ কোম্পানিতে ১ কোটি যুবক-যুবতীর ইনটার্নশিপের ঘোষণা করা হয়েছে। দেশ জুড়ে ৪ কোটি দক্ষ ব্যক্তির কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। সেজন্য অর্থমন্ত্রী বাজেটে ২ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি যুবক-যুবতী রয়েছে ভারতে এবং তাদের বেকারত্ব নিবারণকে কেন্দ্রীয় সরকার চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছে। সরকার আগামী পাঁচ বছরে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ২ লক্ষ কোটি টাকার মেগা প্যাকেজে পাঁচটি প্রকল্পের মাধ্যমে ৪ কোটি যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বাজেট বরাদ্দ করেছে।

কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রধানমন্ত্রীর তরফে প্রদত্ত ২ লক্ষ কোটির এই আর্থিক প্যাকেজে 'এমপ্লয়মেন্ট-লিঙ্কড্ ইনসেনটিভ স্কিম'-নামক এই যোজনার অধীনে প্রথম চাকরিতে যোগদানকারীদের বিশেষ স্বীকৃতিদান ছাড়াও কর্মচারী-সহ চাকুরিদাতা বা নিয়োগকারীদেরও সহায়তা প্রদানের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এই প্যাকেজে প্রধান তিনটি স্কিম ঘোষিত হয়েছে। স্কিম 'এ' অনুযায়ী— সংগঠিত ক্ষেত্রে প্রথম চাকরিতে যোগদানকারী যারা ইপিএফও (এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন)-র অধীনে নিবন্ধিত হবেন, এই ইনসেনটিভ প্রকল্পে তারা এক মাসের মাহিনা (১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত) তিনটি কিস্তিতে পাবেন। এর ফলে দেশ জুড়ে প্রায় ৩০ লক্ষ কর্মচারী উপকৃত হবেন।

ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘোষিত স্কিম 'বি'— কর্মচারী ও নিয়োগকর্তা উভয়কেই ইনসেনটিভ প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এই স্কিমের দরুন 'প্রথম চাকরিতে যোগদানকারীর' সংখ্যা দেশ জুড়ে বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে প্রথম চাকরিতে যোগদানকারীরা প্রথম ৪ বছরের কর্মজীবনে তাদের দ্বারা প্রদেয় ইপিএফ-কন্ট্রিবিউশনের ভিত্তিতে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করবেন। এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত মাইনের কর্মচারীরা এই প্রকল্পের সুবিধালাভের ক্ষেত্রে যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। প্রায় ২.১ কোটি মানুষ এই স্কিমের দ্বারা উপকৃত হবেন।

স্কিম 'সি' অনুযায়ী— এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত মাইনের প্রতিটি নতুন কর্মচারীর নিয়োগকর্তাকে এই কর্মচারীদের পি.এফ জমা করার খাতে দু'বছর ধরে প্রতি মাসে প্রতিদান বা রিয়েমবার্সমেন্ট বাবদ ৩ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। কেন্দ্রের তরফে এই ইনসেনটিভ প্রদানের ফলে ৫০ লক্ষ লোক ভবিষ্যতে কাজের সুযোগ পাবে।

এই তিনটি প্রধান স্কিম ছাড়াও কর্মসংস্থান-জনিত সমস্যা ও কর্মীদের দাবিদাওয়া নিষ্পত্তির লক্ষ্যে 'শ্রম সুবিধা' ও 'সমাধান'-এর মতো পোর্টালগুলি নতুন রূপে চালু করার কথা বাজেটে বলা হয়েছে। ইন্টার্নশিপের মাধ্যমে ভবিষ্যতের কর্মীদের দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যে স্কিম 'ডি' ও 'ই' ঘোষিত হয়েছে। স্কিম 'ডি' অনুযায়ী সরকার ও বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে আগামী ৫ বছরে ২০ লক্ষ যুবক-যুবতী ট্রেনিংপ্রাপ্ত হবেন। তার সঙ্গে এক হাজার আইটিআই-এর আপগ্রেডেশন করা হবে। স্কিম 'ই' অনুযায়ী— আগামী ৫ বছরে এককালীন ৬ হাজার টাকা ও প্রতি মাসে ৫ হাজার টাকা ইন্টার্নশিপ ভাতার সুবিধা-সহ ভারতে ব্যবসারত ৫০০টি বড়ো মাপের কোম্পানিতে এক কোটি যুবক-যুবতী ইন্টার্নশিপের সুযোগ পাবেন।

ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোজেক্ট, এন্ট্রাপ্রেনিয়োরশিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পরিকল্পনা ছাড়াও কর্মরত মহিলাদের জন্য হোস্টেল ও বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমন্বয়ের মাধ্যমে মহিলাদের জন্য নানা ট্রেনিং প্রোগ্রামের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় বাজেটে গৃহীত হয়েছে। এই সমস্ত প্রকল্পের উদ্ভাবনায় সরকার কর্মসংস্থানের বিষয়ে কতটা সচেতন তা সহজেই অনুমেয়। ■

ধর্মজিজ্ঞাসা—উনিশ

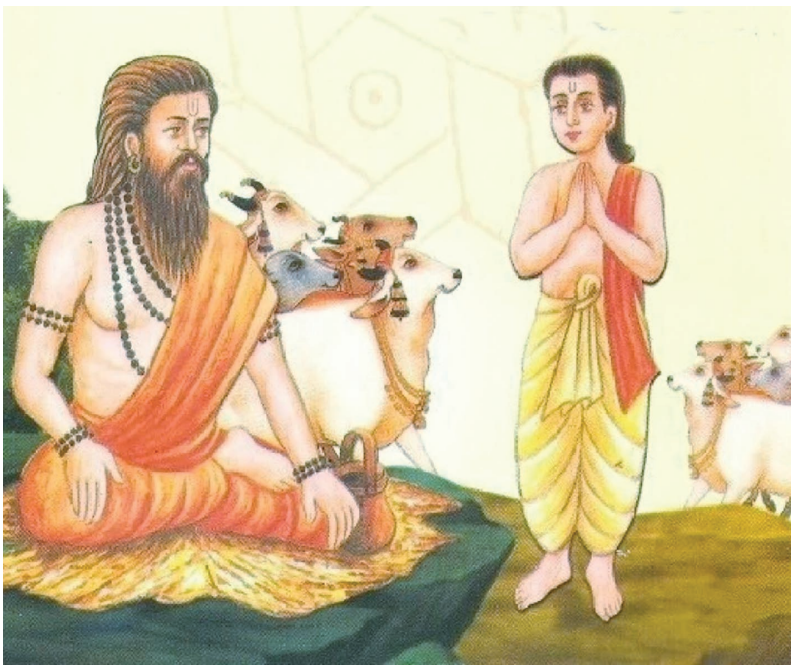

হিন্দুধর্মের ত্রিরত্ন—দমন-দান-দয়া

নন্দলাল ভট্টাচার্য

এবলা-ওবেলা 'গুরুগুরু মেঘ গুমরি গুমরি, গরজে গগনে গগনে।' সে মেঘডম্বরে নিত্যনিনাদিত অনাহত শাশ্বত ধ্বনি— 'দ-দ-দ'— দমন করো— দান করো— দয়া করো। সেই ধ্বনি যেন নিয়ন্ত্রিত করে ভারত-জীবন। ঐহিক, পরমার্থিক সাধন ও সাধনা আবর্তিত ওই ত্রি-স্বরকে কেন্দ্র করেই।

ভারত-ঋষির কথা, মানুষ— হলো ত্রিগুণের অধিকারী। সত্ত্ব-রজ-তম। প্রতিটি মানুষই কম-বেশি ত্রিগুণের আধার। কিন্তু এই তিন গুণ কখনই থাকে না সমভাবে। কারও মধ্যে থাকে সত্ত্বগুণের আধিক্য, কারও মধ্যে রজো কিংবা তমো। গুণের এই আধিক্য অনুযায়ী কেউ সাত্ত্বিক, কেউ রাজসিক আবার কেউ-বা তামসিক।

কেবল মানুষ নয়, বিশ্বস্রষ্টার প্রতিটি সৃষ্টিই ওই ত্রি-গুণময়। সাধারণ ভাবে প্রজাপতির সৃজনের ধারায় দেবতারা সাত্ত্বিক। তাদের মধ্যে রয়েছে সত্ত্বগুণের আধিক্য। সেই গুণেই দেবতারা আত্মবলে সকলের চেয়ে সমৃদ্ধ— শ্রেষ্ঠও। তাই তাঁরা স্বর্গবাসী।

ধনসম্পদে ভরা শস্যশ্যামলা বসুন্ধরায় বাস মানুষের। স্বভাবতই মানুষ লোভী। আত্মমুখী। অন্যকে বঞ্চিত করে সবকিছু ভোগ করার স্পৃহা তাদের মধ্যে প্রবল।

অন্যদিকে পাতালবাসী অসুর বা দানবরা অমিত শক্তির অধিকারী কিন্তু স্বভাব-খল। অযথা উৎপীড়ন করে শান্তি বিনষ্ট করাই তাদের কাজ।

দেবতা, মানুষ, দানব— তিনেই প্রজাপতির সন্তান। তিনের স্বভাবের কথা তাঁর জানা। অথবা বলা যায়, তিনিই তাঁর ওই তিন সন্তানকে এক এক গুণের অধিকারী করেছেন। সৃষ্টির পর প্রজাপতি ব্রহ্মা দেখলেন সব। বুঝলেনও, তাঁর অনুভব, ভিন্ন ভিন্ন গুণের অধিকারী তাঁর এই তিন সন্তানকে যদি আপনগুণ অনুযায়ী চলতে দেওয়া হয়, তাহলে নষ্ট হবে সৃষ্টির ভারসাম্য। আসবে বিপর্যয়। তাই একটা সাম্যের ভাব আনার জন্যই তিনি তিন সন্তানকে দিলেন এক মহাশিক্ষা। প্রত্যেককেই তিনি বললেন, একই কথা। কিন্তু আত্মবুদ্ধিতে সন্তানরা সেই একই কথার করল ভিন্ন অর্থ এবং প্রজাপতি ব্রহ্মা তাদের সেই ধারণাকেই করলেন সমর্থন। বললেন, ঠিকই বুঝেছ তোমরা। এই নীতি অনুযায়ীই তপস্যা করে যাও তোমরা। তাতেই হবে তোমাদের আত্মজ্ঞান— লাভ করবে ব্রহ্ম সাযুজ্য।

প্রজাপতির এই কথায়, মনে জাগতে পারে বিভ্রম। তিনি যে কথা বললেন, তাঁর সন্তানরা তো সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করল তার এবং তিনি সমর্থন করলেন তিনজনকেই। এটা কী করে সম্ভব?

কী করে সম্ভব— তার উত্তর দিয়েছে ভারত-ধর্ম। কারও বিশ্বাস বা উপলব্ধিকেই নস্যাৎ না করে ভারতধর্ম শিখিয়েছে, প্রত্যেককে তার নিজের নিজের ধারায় জীবনযাপন ও সাধনা করতে। বলেছে, তাতেই হবে তাদের ইষ্টলাভ। সাধনার শেষে তিনই মিলবে একই স্থিতির স্থির বিন্দুতে।

ভারতবর্ষের এটাই বৈশিষ্ট্য। পথ নানা। কিন্তু পরিণামে সব পথই মেলে একই বিন্দুতে। অর্থাৎ যে পথই অনুসরণ করা হোক না কেন, সব সাধনার শেষে সকলেরই গন্তব্যস্থান হবে এক— মিলন সকলের সেই একই বিন্দুতে। কেমন করে? তা জানতেই ফেরা যাক, এই কাহিনির একবারে শুরুতে।

প্রজাপতি ব্রহ্মা দেবতা, মানুষ, দানব সৃষ্টির পর তাদের রীতি অনুযায়ীই দিলেন ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা। পিতার কাছেই বনবাসে চলছিল তাদের নিজের নিজের মতো করে সাধনা।

এক সময় সাধনা হলো শেষ। দেবতারা পিতা প্রজাপতি ব্রহ্মাকে প্রণাম করে বললেন, এবার আপনি আমাদের শিক্ষা দিন। উপদেশ দিন পরমার্থ সম্পর্কে।

বেশি কথা না বলে ব্রহ্মা উচ্চারণ করলেন কেবল একটি বর্ণ— 'দ'। দেবতারা শুনলেন 'দ'। স্থিত হলেন তাঁরা।

প্রজাপতি ব্রহ্মা তখন তাঁদের বললেন, কী বুঝলে? জানলেই-বা কী? দেবতারা বললেন, বুঝলাম আপনি বললেন— 'দ' অর্থাৎ দম্যত। আমাদের ইন্দ্রিয় দমন, আত্মদমন করার উপদেশ দিলেন আপনি।

তাঁদের কথা শুনে খুশি হয়ে প্রজাপতি বলেন, ওঁম্— হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো, ঠিকই বুঝেছো তোমরা। এই বোধেই আবিষ্ট হয়ে তপস্যা করো। সিদ্ধিলাভ হবে তোমাদের।

দেবতারা বিদায় নেবার পরই এল মানুষেরা। একই ভাবে প্রজাপতিকে প্রণাম করে বলে, উপদেশ দিন আমাদের। প্রজাপতি তাঁদেরও বললেন, 'দ'। সে কথায়, আনন্দঘন মানুষরা।

তাদের সেইরূপ দেখে প্রজাপতি জিজ্ঞেস করেন, তা কী বুঝলে তোমরা? উত্তরে দেবতাদের মতোই মানুষরাও বলেন, আপনি বললেন 'দ' অর্থাৎ 'দত্ত' অর্থাৎ দান করো। যা উপার্জন করবে তা একা ভোগ না করে অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নাও তা। তাতেই লাভ হবে শ্রেয়।

মানুষের কথায় খুবই খুশি প্রজাপতি। সেই খুশিতেই বললেন, 'ওম্'— ঠিকই বুঝেছো তোমরা। যাও, এবার এই পথেই সাধনা করো তোমরা। সে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করবে তোমরা।

প্রণাম করে বিদায় নেয় মানুষেরা। এবার আসে দানবরা। তাদেরও সেই একই প্রার্থনা প্রজাপতির কাছে। তাদেরও তিনি বলেন, ওই একই কথা— 'দ'। সে উপদেশে উৎফুল্ল দানবরাও। তাদের সে অবস্থা দেখে প্রজাপতি বলেন, তা কী বুঝলে তোমরা? পেলেই-বা কী?

দানবরা বলে, আপনি বললেন, দয়ধ্বম্— দয়া করো। ফুল্ল প্রজাপতি বলেন, 'ওম্'— ঠিকই বুঝেছো তোমরা। যাও এই মতো সাধনা করো তোমরা। এই পথেই পাবে তোমাদের কাঙ্ক্ষিতকে। পূর্ণ হবে মনস্কাম।

প্রজাপতি ব্রহ্মার এ এক চিরন্তন শিক্ষা— দ-দ-দ। — দমং দানং দয়ামিতি। মেঘ গর্জনে আজও ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় সেই চিরন্তন শিক্ষা —দমন করো, দান করো, দয়া করো! এটিই বিশ্ববাসীর কাছে বিশ্বপিতার চিরন্তন শিক্ষা— স্রষ্টার শাশ্বত অনুশাসন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে বিবৃত এই উপাখ্যানে ঋষিবাক্য,— 'দমং, দানম্, দয়ামিতি' শাশ্বত এক উপদেশ। এই উপদেশ বিচ্ছিন্নভাবে দেবতা, মানুষ বা দানবের প্রতি নয়, এই উপদেশ ব্রহ্মার প্রতিটি সন্তানের প্রতি।

'দ'— এই বহু তাৎপর্যময় বর্ণটির মূল কথা, যাঁদের বলা হয়েছে দেবতা, তাঁরা এতই শক্তিমান যে ইচ্ছামতো ত্রিভুবনের যাবতীয় সম্পদ স্বাভাবিক ভাবেই ভোগ করতে পারেন। দেবতারা ইন্দ্রিয়সুখের জন্য প্রলুব্ধ হয়ে উঠলে দেখা দেবে বিপর্যয় এবং তাতে শক্তির অপপ্রয়োগও ঘটতে পারে। দেবতারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্তির বলে সব কিছু অধিকার করলে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হবে ন্যূনতম প্রয়োজন থেকেও। ওই সামাজিক অসাম্য দূর করার জন্যই দেবতাদের ইন্দ্রিয়দমন বা আত্মদমনের উপদেশ দেন প্রজাপতি।

মানুষ স্বভাবতই লোভী। নিজেদের ভোগবাসনা মেটাবার জন্য তারা অন্যকে বঞ্চিত করে থাকে। তাদের এই লোভ যদি একই ভাবে চলতে থাকে তাহলে সামগ্রিকভাবে বিপন্ন হবে জীবজগৎ। মানুষ যদি ত্যাগের সঙ্গে ভোগ না করে, তাহলে শেষ পর্যন্ত বিপন্ন করবে নিজের শান্তিকে। ভ্রষ্ট হবে নিজের লক্ষ্য থেকে। সে কারণেই, সবকিছু একা ভোগ না করে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার মানসিকতা তৈরির ওপর জোর দিয়ে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণের থেকে বিরত থাকার জন্যই দান করার উপদেশ দিয়েছেন প্রজাপতি। মানুষের প্রতি প্রজাপতির উপদেশ, হৃদয়বৃত্তির প্রসার ঘটাও। সামগ্রিক কল্যাণে আত্মনিয়োগ করো। দান করার মধ্য দিয়েই মানুষ চিরন্তন শান্তির সন্ধান পাবে।

অসুর বা দানবদের প্রতি প্রজাপতির উপদেশ, দয়া করো। অসুররা স্বভাবতই খল প্রকৃতির। শারীরিক শক্তিতে তারা সবকিছু দখল করতে চায়। অকারণে অন্যকে উৎপীড়ন করে শান্তি বিঘ্নিত করাই তাদের লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে স্থির থেকেই তাণ্ডবসৃষ্টিতে তৎপর হয় তারা। এসব কাজ সামগ্রিকভাবে নষ্ট করে ভারসাম্য, শান্তিও। সে কারণেই অসুরদের প্রতি তাঁর উপদেশ— দয়া করো।

ঋষি ও তত্ত্বদর্শীদের অভিমত, দেবতা, মানুষ ও অসুরদের স্বভাব ও প্রকৃতির প্রকাশ দেখা যায়, ব্যক্তি মানুষের ক্ষেত্রে। প্রতিটি মানুষই এই ত্রিবিধ গুণ বা শক্তির অধিকারী। যে কারণে প্রতিটি মানুষকেই দেবত্বে উন্নীত হতে হবে। একইসঙ্গে সামগ্রিকভাবে প্রতিটি মানুষকেই প্রজাপতি নির্দেশিত ওই ত্রিনীতি 'দমন-দান-দয়া' অনুসরণ করতে হবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয়-দমন একটি অপরিহার্য সাধনা। ইন্দ্রিয়ই সব ধরনের পতনের অন্যতম কারণ। ইন্দ্রিয়ের প্রভাবেই পথভ্রষ্ট হয় বহুসময় একজন সাধকও। তাই প্রত্যেকের উচিত, এই ইন্দ্রিয়কে বশ মানানো। ইন্দ্রিয়দমন বা ইন্দ্রিয়কে সংযত করতে পারলেই সাধনার বিভিন্ন ক্রম অতিক্রম করা যায়। তাই প্রজাপতি নির্দেশিত 'দ-অর্থাৎ দমন'-কে জীবনের মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করাটাই হবে মানবজীবনের অন্যতম লক্ষ্য।

একইভাবে দান যে কোনো ব্যক্তিকে ধর্মাচরণ বা আধ্যাত্মিকতার পথে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যায়। মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত হলো দান। দানের গুণে ব্যক্তি-জীবনের যে মহত্তর উত্তরণ ঘটে তার নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে ভারত-জীবনের অসংখ্য ঘটনায়। দানের মহিমা প্রতিষ্ঠার জন্যই দানবরাজ বলি অবরুদ্ধ ও প্রবঞ্চিত হচ্ছেন জেনেও বামনরূপী বিষ্ণুকে ত্রিপাদ ভূমি দানের অঙ্গীকার রক্ষায় শেষপর্যন্ত পেতে দিয়েছিলেন নিজের মাথা। বন্দি হয়েছিলেন পাতালে।

একইভাবে মহাভারতের অনন্য চরিত্র কর্ণ মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও সহজাত কবচকুণ্ডল নির্দ্বিধায় দান করেন ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণকে। দানের মতোই ব্যক্তিজনের এক পরম সম্পদ দয়া। দুর্বলকে তো বটেই, যে

কোনো প্রাণীকে দয়া করতে পারলে লাভ করা যায় পরম কারুণিকের করুণা। এইভাবে 'দয়া' করেন যিনি তিনি ওই গুণেই এগিয়ে যান ঈশ্বরলাভের পথে। তবে এই দান করতে হবে সৎভাবে অর্জিত অর্থে। অন্যায়ভাবে লব্ধ ধনে দান করলে কাঙ্ক্ষিত ফল তো হয়ই না। বরং ঘটে বিপরীত ফল।

প্রজাপতি নির্দেশিত ত্রি-মন্ত্র— দমন, দান,দয়ার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শ্রদ্ধা। বস্তুত, শ্রদ্ধার সঙ্গে এই ত্রি-মন্ত্রের রয়েছে এক আত্মিক বন্ধন। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির পক্ষে ইন্দ্রিয়দমন যেমন সম্ভব নয়, একই ভাবে শ্রদ্ধাহীন দান বা দয়া প্রদর্শনও শেষপর্যন্ত বাঞ্ছিত ফল দেয় না কোনো সময়েই।

ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রেই কেবল নয়, পার্থিব জীবনের নানা ক্ষেত্রে শ্রদ্ধার রয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা। জীবনের প্রতিটি কাজই করতে হয় শ্রদ্ধার সঙ্গে। শ্রদ্ধার অভাব ঘটলে তা সে যে কাজই হোক না কেন, তা কোনো সময়ই সার্থক হয় না।

শ্রদ্ধা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ভারতের ঋষি এবং অন্যান্যরা বলেন, শ্রদ্ধার স্থান মানুষের হৃদয়ে— 'শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতেতি হৃদয় ইতি হোবাচ। হৃদয়েন হি শ্রদ্ধাং জানাতি হৃদয়ে হ্যেব শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতা'।। (বৃহদারণ্যক ৩/৯/২১)— যার সহজ অর্থ হলো, হৃদয় দিয়েই শ্রদ্ধাকে জানা যায়। সেকারণে হৃদয়েই শ্রদ্ধার বাস।

শ্রদ্ধা সম্পর্কে ঋষিদের এমন সশ্রদ্ধ উল্লেখ দেখে শ্রদ্ধার প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতেই পারে। শ্রদ্ধা একটি সংস্কৃত শব্দ। ইংরেজিতে এর যথার্থ রূপটি প্রকাশ করতে পারে এমন কোনো শব্দ পাওয়া যায় না। সাধারণভাবে শ্রদ্ধার ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে Faith বা Belief শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ওই শব্দে শ্রদ্ধার প্রকৃত অবস্থার প্রকাশ ঘটে না। Faith বা Belief শব্দ দুটির অর্থ— বিনা প্রশ্নে অন্ধভাবে কোনো কিছুকে মেনে নেওয়া। কিন্তু শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে অন্ধভাবে সব কিছু মেনে নেওয়া নয়— কোনো সময়েই। শ্রদ্ধা হলো নিঃশর্তভাবে 'শাস্ত্রসত্য'— এই বাক্যে সম্পূর্ণ আস্থা রাখা।

শ্রদ্ধার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কৌতূহল ও বিশ্বাস। এই কৌতূহল ও বিশ্বাসই বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে একটা সেতু গড়ে তোলে। আর সেই সেতুপথেই পৌঁছনো যায় চরম লক্ষ্যে। অন্য কথায়, শ্রদ্ধা হলো জীবনের শ্রেয় এবং শ্রেয়র লক্ষ্যে আবর্তিত এক বিশ্ববীক্ষা। অন্য অর্থে শ্রদ্ধা হলো ব্যক্তির মূল্যবোধ। শ্রদ্ধা হলো সৎ ও সুন্দর জীবনের প্রতীক। অন্য কথায়, শ্রদ্ধা হলো নিজেকে জানার বা উপলব্ধি করার একটি পথ। শ্রদ্ধা হলো সর্বার্থেই মানুষের একটি বৈশিষ্ট্য।

সব মিলিয়ে বলা যায়, শ্রদ্ধা হলো একটি অনুভব যা পরম উপলব্ধি। শ্রদ্ধাকে চিরন্তন সত্যমুখী অন্তর্নিহিত আলোকশিখা বলে বর্ণনা করেছেন ভারত-ঋষিরা। তাঁদের কথা, আধ্যাত্মিক পথে সত্য অনুধাবনের শক্তি, আত্মানুসন্ধান ও আত্মজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হলো শ্রদ্ধা।

এই বিশ্বে অবশ্য কপট শ্রদ্ধার অনুসারীর সংখ্যা কম নয়। কপট শ্রদ্ধাধারীরা সাময়িকভাবে মানুষকে প্রভাবিত করলেও শেষপর্যন্ত ফাঁকে পড়েন নিজেরাই। শ্রদ্ধালু হওয়ার ফল লাভতো হয়ই না বরং কপট শ্রদ্ধার জন্য তাঁদের হয় অধোগতি।

প্রকৃত শ্রদ্ধাবানের স্বরূপ প্রকাশ করে শাস্ত্রকাররা বলেছেন, যখন ব্যক্তির অন্তর ও বাইরের সব শক্তি মিলেমিশে এক ঐশ্বরিক আদর্শের দিকে ধাবিত হয়, তখন ব্যক্তি অভিহিত হয় প্রকৃত শ্রদ্ধাবান হিসেবে। অন্য অর্থে, ব্যক্তি শ্রদ্ধারই এক প্রকৃতি। সে কারণে ব্যক্তিই শ্রদ্ধা। অর্থাৎ ব্যক্তিই তখন যেন শ্রদ্ধার রূপ পরিগ্রহ করে।

শাস্ত্রকাররা আরও বলেন, শ্রদ্ধা কেবল ঈশ্বর বিশ্বাস নয়, শ্রদ্ধা হলো আত্মবিশ্বাস। ব্যক্তির জীবনযাপন ও আত্মানুসন্ধান বা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়ায় আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র করে তোলে এই শ্রদ্ধাই। শ্রদ্ধার মূল্যেই ব্যক্তি তখন গুছিয়ে নিতে পারে তার শেষ পারানির কড়ি। সাধনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে চিরবাঞ্ছিতের সঙ্গে মিলনের পথে। শ্রদ্ধাই ব্যক্তিকে ধাপে ধাপে উন্নত করে তাকে পৌঁছে দেয় চিরশান্তি ও প্রাপ্তির দেশে। আর সে কারণেই প্রকৃত শ্রদ্ধাবান হওয়ার জন্য প্রয়োজন বিশ্বাস ও চারিত্রিক দৃঢ়তার।

এতকিছু করার পরও ঋষিরা বলেছেন, শ্রদ্ধা হলো তিন রকম— তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক। সাধনার মধ্য দিয়ে মানুষ যখন নিজেকে উন্নত করে তখনই একে একে শ্রদ্ধার প্রথম দুটি অর্থাৎ তামসিক ও রাজসিক ধাপ পার হয়ে সাত্ত্বিক হয়ে ওঠে। চরম সাত্ত্বিকতাই ব্যক্তিকে দেবতা করে তোলে।

উপনিষেদের শুরুতেই তাই বলা হয়েছে, শ্রদ্ধা বলতে বোঝায় ধর্ম ও সত্যের প্রতি অনুরাগ। সে কারণেই ঋষিকুমার নচিকেতা তাঁর বাবা বাজশ্রবাকে যজ্ঞশেষে দক্ষিণা দিতে দেখে শ্রদ্ধায় আপ্লুত হলেন। সেই শ্রদ্ধার স্রোতে ভাসতে ভাসতেই তিনি শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর অধিপতি যমের কাছ থেকে লাভ করেন আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান।

শ্রদ্ধাবান না হলে কেউ কিন্তু এই জ্ঞান লাভ করতে পারেন না। তাই গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্। শ্রদ্ধাবানরাই জ্ঞান লাভ করেন সেই সত্য— পরা ও অপরা দুই বিদ্যার ক্ষেত্রেই। শ্রদ্ধার মূল্যে অর্জিত জ্ঞানই মানুষকে করে তোলে প্রসন্ন। পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাস ভাষ্যে তাই বলা হয়েছে— 'চেতসঃ সম্প্রসাদঃ শ্রদ্ধা। সব হি জননীব কল্যাণী যোগিনং পতি'।। শ্রদ্ধা চিত্তের সম্যক প্রসন্নতার বিকাশ ঘটায়। অসৎকে দূরীভূত করে শ্রদ্ধাই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সত্য সুন্দরের পথে পরিচালিত করে। তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণ (১১।৮।৮) তাই বলা হয়েছে— সবসম্পদের সেরা সম্পদ হলো শ্রদ্ধা— 'শ্রদ্ধাম্ ভগস্য মূর্ধনি। বচসা বেদয়া মসি।' শ্রদ্ধাই বিশ্ব— 'শ্রদ্ধা বিশ্বমিদম্ জগৎ।' শ্রদ্ধাই খুলে দেয় সব পাওয়ার দুয়ার। শ্রদ্ধাই তাই ভারতবর্ষে জীবনের ব্রত।

গীতা, উপনিষদ ও ভাগবত স্বর্গীয় আনন্দের উৎস

ড. পূর্ণেন্দু শেখর দাস

গীতা হচ্ছে কৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন। কিন্তু এর আগেও পরমেশ্বর বহুবার গীতায় নিহিত জ্ঞান প্রদান করেছেন। একথা গীতার চতুর্থ অধ্যায় জ্ঞানযোগের প্রথম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলছেন— 'এই অবিনাশী যোগ আমি সূর্যকে বলেছিলাম, সূর্য তাঁর পুত্র বৈবস্বত মনুকে এবং মনু তাঁর পুত্র রাজা ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। এইভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে পরম্পরাগতভাবে এই জ্ঞান অর্জন করে আসছেন রাজর্ষিরা। কিন্তু কালান্তরে এই যোগ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।' সেই পুরনো যোগই ভগবান পুনরায় জানাচ্ছেন অর্জুনকে। এই তথ্য আমরা জানতে পারি, গীতায় জ্ঞানযোগের তৃতীয় শ্লোকে।

গীতা ও উপনিষদ। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে বেদব্যাস গীতাকে উপনিষদ বলেই আখ্যা দিয়েছেন। উপনিষদ তত্ত্বই গীতায় পত্রপুষ্পে শোভিত ও পরিবর্ধিত। 'গীতাধ্যানে' আছে— উপনিষদরূপ গাভী সমূহের দুগ্ধই হচ্ছে গীতামৃত। উপনিষদের নিগূঢ় নির্যাস শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের জন্য গীতামৃতরূপে পরিবেশন করেছেন। উপনিষদ সমূহের মতো গীতাও আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্বের ঘোষণা করেছে। ব্রহ্মতত্ত্বের এমন সুললিত ও সহজবোধ্য ব্যাখ্যা অন্য কোনো গ্রন্থে দেখা যায় না। শঙ্করাচার্য তাই তাঁর উপনিষদ ও গীতার ভাষ্যে একই তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লীর ১৫নং শ্লোকের সঙ্গে গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ১১নং ও ১২নং শ্লোকের মূল কথা এক; সেটি হচ্ছে 'ওঁ' মাহাত্ম্যের কথা। ঈশোপনিষদের পঞ্চম শ্লোক গীতার ১৩ অধ্যায়ের ১৬নং শ্লোক এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২৯নং শ্লোকের মূল কথা একই। মুণ্ডক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম বল্লীর দ্বিতীয় শ্লোকের সঙ্গে গীতার ১৩ অধ্যায়ের ১৫নং শ্লোকের সাদৃশ্য আছে। এভাবে সাদৃশ্য যুক্ত ও সমানার্থক শ্লোক আরও উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তাই গীতা উপনিষদের শ্রেষ্ঠ ভাষ্য। বেদতুল্য গীতার ভাগবত বাণী নিত্য ও অপৌরষেয়। গীতা তত্ত্ব ও বেদবাণী অভেদ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'গীতা বেদের সর্বোত্তম ভাষ্য। উপনিষদ হতে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কুসুমরাজি চয়ন করে গীতারূপে এই সুদৃশ্য মালা গাঁথা হয়েছে।

মহর্ষি বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র, মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করার পর মহামুনি নারদের উপদেশে শ্রীমদ্ভগবদগীতা প্রণয়ন করেন। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, ব্যাসদেব তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি ও রচনাবলীর সার নির্যাস একত্রিত করে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগের অপূর্ব সমন্বয়ে ভাগবতধর্ম পরিবেশন করেছেন অমর গীতা গ্রন্থে। ভগবতে আছে সর্বমোট ১২টি স্কন্ধ। ভগবত আরম্ভ হয়েছে 'জন্মাদাস্য... সতং পরং ধীমহি' দিয়ে। অর্থাৎ 'আমরা সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি। আর গীতাতে আছে মোট ১৮টি অধ্যায়। আরম্ভ হয়েছে— অর্জুন বিষাদ যোগে 'ধৃতরাষ্ট্র উবাচ...' দিয়ে। ভগবতে আছে 'মূলং কৃষ্ণঃ', সেই পুরোষত্তম শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব থেকে তিরোভাব পর্যন্ত। কিন্তু গীতাতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আরম্ভ থেকে অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্রের কথা দিয়ে আরম্ভ করে, কৃষ্ণ-অর্জুনের কথোপকথন এবং পরে শেষ হয়েছে সঞ্জয়ের সমাপ্তি বাক্য দিয়ে। গীতা ও ভাগবতে একই তত্ত্ব উপদিষ্ট হয়েছে। উভয় গ্রন্থেই একই অবতারের উপদেশ বিবৃত।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে এবং ভগবতের একাদশ স্কন্ধে 'জ্ঞানযোগ' বর্ণিত। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে এবং ভগবতের দশম স্কন্ধে 'ভক্তিযোগ' বিবৃত হয়েছে। এই উভয় গ্রন্থেই সমানভাবে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগতত্ত্ব স্থান পেয়েছে। গীতায় আছে, 'অনন্য চিত্তে যাহারা সতত আমার স্মরণ মনন করে আমি তাহাদের নিকট সুলভ'। গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ের ২৬নং শ্লোকে ভগবান বলেছেন— 'অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারা ত্রিগুণাতীত হওয়া যায়।' ঠিক একই ভাবে ভাগবতেও আছে, 'আত্মারাম মুনিগণ অহৈতকী ভক্তিলাভ করেন।' আর গীতার মতো ভাগবতেও আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভের কথা বলা হয়েছে। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৬নং শ্লোকে শ্রীভগবান ভক্তকে সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে তাঁর শরণাগত হবার উপদেশ দিয়েছেন।

গীতা সকল ধর্মের, সকল সম্প্রদায়ের, সকল শ্রেণীর ধর্মগ্রন্থ হবার যোগ্য। গীতা শাস্ত্রে কোনো গোঁড়ামি বা সংকীর্ণতা স্থান পায় নাই। ব্রিটিশ ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস চার্লস উইলকিন্সের দ্বারা করা গীতার ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় লিখেছিলেন, 'গীতা পাঠের দ্বারা শুধু ইংরেজরা কেন, সমস্ত বিশ্ববাসী উপকৃত হবে। গীতা ধর্মের অনুশীলনে মানবজীবন শান্তিধামে পরিণত হবে।' এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে,— মোগল সম্রাট শাহজাহানের পুত্র দারাশিকো লিখেছেন, 'গীতা স্বর্গীয় আনন্দের অফুরন্ত উৎস। সর্বোচ্চ সত্য লাভের সুগম পথ গীতায় প্রদর্শিত।'

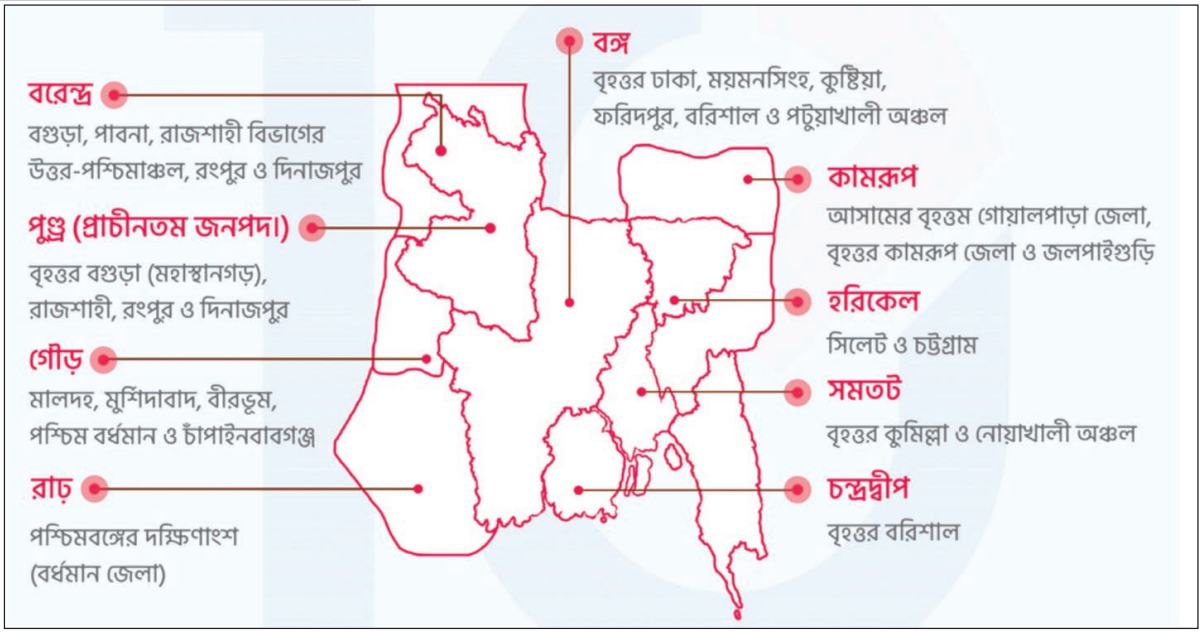

প্রাচীন বঙ্গের জনপদ

গোপাল চক্রবর্তী

প্রাচীন যুগে বঙ্গদেশের কোনো একক রাজনৈতিক সত্তা ছিল না। বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন নামে অভিহিত হতো। এই নাম থেকে প্রাচীন বঙ্গের জনপদ সম্বন্ধে অনুমান করা যায়। মহাভারতে অঙ্গ, পুণ্ড্র, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত, মগধ, প্রাগ্‌জ্যোতিষ প্রভৃতি উত্তরপূর্ব ভারতের স্বাধীন ও স্বশাসিত রাজ্যের উল্লেখ আছে। রামায়ণে সুহ্ম, পুণ্ড্র, অঙ্গ, বঙ্গ ইত্যাদি রাজ্যের উল্লেখ দেখা যায়। মহাকাব্যদ্বয়ে এই রাজ্যসমূহের উল্লেখ থেকে এদের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা যায় না। তবে ঐতিহাসিকযুগের সূত্রসমূহের ভিত্তিতে বাঙ্গলার কয়েকটি জনপদ সম্বন্ধে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়।

পুণ্ড্রবর্ধন ঃ করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে প্রাচীন পুণ্ড্ররাজ্যের প্রশাসনিক কেন্দ্র পুণ্ড্রবর্ধন নগর অবস্থিত ছিল। পুণ্ড্রনগরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নিয়ে পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্য গঠিত ছিল। মহাভারতের যুগেই পুণ্ড্রবর্ধন একটি শক্তিশালী জনপদ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। নবম শতাব্দীর লেখক রাজশেখর তাঁর কাব্যমীমাংসায় পুণ্ড্ররাজ্যের উল্লেখ করেছেন। মৌর্যযুগে পুণ্ড্রবর্ধনরাজ্য ভুক্তি বা প্রদেশে পরিণত হয়। গুপ্তযুগে সমগ্র বরেন্দ্র অঞ্চল নিয়ে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি গঠিত হয়। এটি গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্যতম সমৃদ্ধিশালী ভুক্তি বা প্রদেশরূপে গণ্য হতো। সেই সময় থেকে সমগ্র প্রাচীনযুগে পুণ্ড্রবর্ধন প্রাচীন বঙ্গের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে। দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত 'ত্রিকাণ্ডশেষ' নামক গ্রন্থে পুণ্ড্র ও বরেন্দ্রকে সমার্থকরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। গুপ্তোত্তরযুগে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির মর্যাদা এত বেশি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল যে বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের শাসকেরাও নিজেদের রাজ্যকে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি বলে পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন। উদাহরণস্বরূপ, গুপ্ত সাম্রাজ্যাধীন পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অনুকরণে পরবর্তীকালে পালবংশীয়দের শাসনাধীন রাজ্যও পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি নামে পরিচিত ছিল। কোটিবর্ষ, গৌড়, পাণ্ডুনগর (পাণ্ডুয়া), লক্ষ্মণাবতী, রামাবতী প্রভৃতি প্রাচীন শাসনকেন্দ্র ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মূল পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তিতে অবস্থিত ছিল। মৌর্যযুগে ও গুপ্তযুগে পুণ্ড্রনগর (মহাস্থান) পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির রাজধানী ছিল। পুণ্ড্রনগর ছিল দুর্ভেদ্য প্রাকার বেষ্টিত বিশাল নগর। প্রাচীন কোটিবর্ষ নগর উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল। প্রাচীন জৈন গ্রন্থে কোটিবর্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়। কোটিবর্ষ দেবকোট নামেও পরিচিত ছিল। দেবীভাগবত পুরাণে (৭।৩৮) মহাস্থানের উল্লেখ আছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতম্' কাব্যে এই নগরীর কাব্যিক বর্ণনা আছে।

অঙ্গ ঃ প্রাচীন ভারতের ষোড়শ মহান জনপদের অন্যতম জনপদ অঙ্গ রাজ্যের উল্লেখ মহাভারত, অঙ্গুত্তর, দীর্ঘ নিকায় এবং জৈনগ্রন্থ ভাগবতী সূত্রে দেখা যায়। অঙ্গরাজ্যের রাজধানীর নাম চম্পা। মহানন্দা নদীর পশ্চিম তীর থেকে কোশী নদীর পূর্বতীর পর্যন্ত এই রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল। প্রাক্ গুপ্ত ও গুপ্তশাসনকালে অঙ্গরাজ্য তীরভুক্তি নামেও পরিচিত ছিল। পাল শাসনকালে অঙ্গ রাজ্যের বৃহৎ অংশই শ্রীনগরভুক্তির অন্তর্গত ছিল। বঙ্গে প্রবেশের পথে অবস্থিত বলে অঙ্গরাজ্যকে দ্বারবঙ্গও বলা হতো। তীরভুক্তির অপভ্রংশ রূপ ত্রিহুত। মধ্যযুগে ত্রিহুত মিথিলা নামেই অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং মিথিলা ধর্ম, বিদ্যা ও সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্রস্থল ছিল। মধ্যযুগে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পূর্ণিয়া নামে পরিচিত ছিল। বর্তমান ভাগলপুর জেলার অধিকাংশ অঞ্চল অঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

গৌড় ঃ প্রাচীন জনপদ গৌড় গঙ্গানদীর তীরে এবং বরেন্দ্র অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। প্রাচীনযুগের রচনাবলীতে গৌড়ের প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়। বরাহমিহির কৃত বৃহৎসংহিতায় গৌড়ের উল্লেখ আছে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বিভিন্ন প্রসঙ্গে গৌড়ের উল্লেখ আছে। ত্রিকাণ্ডশেষ নামক সংস্কৃত অভিধান গ্রন্থে পুণ্ড্র,

ফঃ ৫

বরেন্দ্রী, নীবৃৎ ইত্যাদি গৌড়ের পর্যায়ক্রমিক নাম ছিল। এ থেকে মনে হয় উত্তরবঙ্গে বরেন্দ্র অঞ্চলের দক্ষিণাংশ সাধারণভাবে গৌড় নামে অভিহিত হতো। প্রাচীন ও মধ্যযুগে সমগ্র বঙ্গ অনেক সময়ে গৌড় নামে অভিহিত হতো। বাণভট্ট তাঁর হর্ষচরিতে মহারাজ শশাঙ্ক শাসিত সমগ্র অঞ্চলকে গৌড় বলে অভিহিত করেছেন। রাজতরঙ্গিনীতে উল্লিখিত 'পঞ্চ গৌড়' সমগ্র গৌড় রাজ্যকেই নির্দেশ করে। পরবর্তী পালযুগের রাজন্যবর্গকে তাম্রশাসনসমূহে গৌড়েশ্বর বলে পরিচিতি দেওয়া হয়েছে।

সুহ্ম বা রাঢ় ঃ রাঢ় অঞ্চলে প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগের সংস্কৃতির প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গেছে। সুপ্রাচীন যুগের রাঢ় সুহ্ম নামেও পরিচিত ছিল। প্রাচীন জৈন গ্রন্থে রাঢ় ও সুহ্ম (সুব্ভভূমি) উভয় নামেরই উল্লেখ দেখা যায়। মহাভারত, বৃহৎসংহিতা, ভাগবতীসূত্র এবং রাজশেখরের কর্পুরমঞ্জুশ্রী নাটকে রাঢ় ও সুহ্ম এর উল্লেখ আছে। মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশে এবং দণ্ডীর দশকুমার চরিতে সুহ্মরাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাম্রশাসনের বর্ণনাযায়ী রাঢ় উত্তর ও দক্ষিণে বিভক্ত ছিল। অজয় নদ দ্বারা এই বিভাজন রেখা চিহ্নিত হতো। ভোজবর্মন, বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের তাম্রলিপিতে উত্তর রাঢ়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমালাই শিলালিপিতে তক্কণ লাঢ়ম বা দক্ষিণরাঢ়ের উল্লেখ আছে। প্রাচীন বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ নদীবন্দর সপ্তগ্রাম দক্ষিণ রাঢ়ে ভাগীরথী তীরে অবস্থিত ছিল। মহারাজ জয়নাগ, মহারাজ শশাঙ্ক এবং মহারাজ ভাস্করবর্মণের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ রাঢ়ে অবস্থিত ছিল।

সমতট ঃ বৃহৎসংহিতা, দেবীপুরাণ, আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প প্রভৃতি শাস্ত্রীয় গ্রন্থে সমতট রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজনৈতিক ভূখণ্ড হিসেবে সমতটরাজ্যের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে। এই প্রশাস্তিলিপি প্রাক্গুপ্তযুগে সমতট রাজ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। মূল সমতট রাজ্য লালমাই-ময়নামতী পার্বত্য অঞ্চলে এবং এর চারপাশের সমভূমি নিয়ে গঠিত ছিল। প্রাচীনকালে সমতট রাজ্যের বিস্তৃতি এর শাসকদের সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করত। উত্তরে কুশিয়ারা, দক্ষিণে ফেনী, পশ্চিমে মেঘনা এবং পূর্বে ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলের সানু দেশ সমতট রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তৃতি বলে অনুমান করা যেতে পারে। সমতট রাজ্যের রাজধানী দেবপর্বত বর্তমান অনুচ্চ ময়নামতী পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষীরোদা নামে অধুনালুপ্ত একটি ক্ষুদ্র নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সমতট অঞ্চলের দেববংশীয় রাজধানী মেহের বা মেহেরাগ্রামে অবস্থিত ছিল। হিউয়েন সাঙের বিবরণে কিয়া মো লোং কিয়া (কোমলাংক) নামক যে জনপদের উল্লেখ আছে পণ্ডিতেরা তার সঙ্গে কুমিল্লার অভিন্নতা কল্পনা করেন।

বঙ্গ ঃ বঙ্গ একটি প্রাচীন রাজ্য। বঙ্গ নামক রাজ্যের উল্লেখ রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থে পাওয়া গেলেও এর রাজনৈতিক সত্তা কীরূপ ছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। জৈনগ্রন্থ ভাগবতী সূত্র, আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প এবং বরাহমিহিরকৃত বৃহৎসংহিতায় বঙ্গের উল্লেখ আছে। বঙ্গাল অথবা শ্রীবঙ্গাল নামটির উল্লেখ সমতট রাজ্যের দেবরাজবংশীয়দের তাম্রশাসন এবং এর পরবর্তীতে পূর্ববঙ্গের চন্দ্রবংশীয়দের তাম্রশাসনে দেখা যায়। প্রধানত, চন্দ্রদেব এবং পরবর্তী সেন রাজগণের তাম্রলিপিতে প্রাচীন বঙ্গের নির্দিষ্ট অবস্থান সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। তবে প্রাচীনকালে ভুক্তি মণ্ডল, বিষয় ইত্যাদি রাজনৈতিক পরিচয়ে বঙ্গের নাম পাওয়া যায় না। দেশ পরিচিতিতে বাংলাদেশের (বঙ্গালদেশ) উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজা চন্দ্রের মেহেরৌলি লৌহস্তম্ভ লিপিতে এবং রাজেন্দ্র চোলের তিরুমালাই শিলালিপিতে চেদিরাজ কর্ণদেবের গোহারাওয়া তাম্রলিপিতে বঙ্গালের উল্লেখ আছে। বিশ্বরূপ সেনের একটি তাম্রশাসনে বঙ্গের নামোল্লেখ আছে এবং বিক্রমপুর নামক 'ভাগ'-এর অন্তর্গত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর অপর একটি তাম্রশাসনে বঙ্গাল বড়ার উল্লেখ আছে এবং নাব্য নামক অঞ্চলটি এর অন্তর্গত বলা হয়েছে। উভয় বর্ণনা পাঠে মনে হয় বঙ্গ বা বঙ্গাল আদিতে একটি বড়ো গ্রাম (বড়া) ছিল। পরবর্তীকালে পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, লক্ষ্যা প্রভৃতি নদীর পরস্পর মিলনস্থানের নাব্য অঞ্চল নিয়ে বৃহত্তর বঙ্গদেশ গঠিত হয়। বিক্রমপুর সুবর্ণগ্রাম এর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। তিরুমালাই শিলালিপিতে বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখে মনে হয় সরকারিভাবে চন্দ্রদেব রাজ্য পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি নামে পরিচিত হলেও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে এটি বঙ্গালদেশ নামে পরিচিত ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত 'অভিধানচিন্তামণি' গ্রন্থে বঙ্গের উল্লেখ আছে। শক্তিসঙ্গম-তন্ত্রে বঙ্গদেশের সীমানা নির্দেশ করে বলা হয়েছে—

রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগঃ শিবে।
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃসর্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ।।

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় সমুদ্রতট থেকে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বঙ্গদেশ উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল। উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের ভৌগোলিক সীমানা স্থায়ীভাবে পর্বত ও সমুদ্র দ্বারা চিহ্নিত করা গেলেও পূর্ব ও পশ্চিমে এর সীমানা গেলেও পূর্ব ও পশ্চিমে এর সীমানা ভৌগোলিক পারিপার্শ্বিকতার দ্বারা চিহ্নিত করা সম্ভব ছিল না। কারণ উভয়দিকে রাজনৈতিক কারণে প্রায়ই সংকোচন ও সম্প্রসারণ হতো।

হরিকেল ঃ খ্রিস্টীয় নবম-দশম শতাব্দীতে রাজা কান্তিদেবের চট্টগ্রাম তাম্রলিপিতে এবং শ্রীচন্দ্রের তাম্রলিপিতে হরিকেল রাজ্যের উল্লেখ দেখা যায়। চৈনিক পরিব্রাজকদের ভ্রমণবৃত্তান্তে হরিকেল রাজ্যের উল্লেখ আছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত অভিধান চিন্তামণিতে হরিকেল রাজ্যকে বঙ্গের সমার্থকরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ একাদশ শতাব্দীতে হরিকেল রাজ্য বঙ্গের শাসনকর্তা চন্দ্রবংশীয়দের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ফেনী নদীর তীর থেকে শঙ্খনদের উত্তর তীর পর্যন্ত ভূখণ্ড হরিকেল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হরিকেল রাজ্যের রাজধানী বর্ধমানপুর কর্ণফুলী নদীর মোহনার নিকটে নদীর বাম তীরে বতমান দেয়াঙ পাহাড়ের পূর্ব সানুদেশে অবস্থিত ছিল। পুরাণ এবং কয়েকটি শাক্তগ্রন্থে চন্দ্রনাথ পর্বত, চট্টগ্রাম ও চট্টলের উল্লেখ দেখা যায়। খ্রিষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পর থেকে হরিকেল রাজ্যের নাম খুব একটা দেখা যায় না। খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে চট্টগ্রাম অঞ্চল আরাকানিদের দ্বারা বিজিত হয়। আরাকানি শব্দ চেত তৌ গং থেকে চাটগাঁও শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

বর্ধমান ভুক্তি ঃ দেবীপুরাণে (৪৬শ অ.) বর্ধমানকে একটি পৃথক রাজনৈতিক ভূখণ্ড হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বরাহমিহিরকৃত বৃহৎসংহিতায় বর্ধমানের উল্লেখ আছে। মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের অধীনে প্রাদেশিক শাসনকর্তা বিজয়সেন কর্তৃক প্রচারিত তাম্রলিপিতে বর্ধমানভুক্তির উল্লেখ দেখা যায়। বর্ধমানভুক্তি বরাবরই পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি থেকে পৃথক ছিল। রাজা নয়পালদেবের ইরদা তাম্রশাসনে দণ্ডভুক্তি মণ্ডলকে বর্ধমানভুক্তির অন্তর্ভুক্তরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। রাজা বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্রশাসনে বর্ধমানভুক্তির উল্লেখ আছে। অনেক সময়ে রাঢ়ের দক্ষিণভাগ বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীন সপ্তগ্রাম বন্দরও বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তাম্রলিপ্ত-দণ্ডভুক্তি ঃ প্রধানত তাম্রলিপিসমূহে দণ্ডভুক্তির উল্লেখ দেখা যায়। বর্ধমানভুক্তির দক্ষিণে দণ্ডভুক্তি অবস্থিত ছিল। বর্তমান উত্তর ওড়িষশা ও মেদিনীপুর দণ্ডভুক্তির অন্তর্গত ছিল। সম্ভবত দণ্ডভুক্তি নামের পূর্বে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল তাম্রলিপ্ত রাজ্য নামে পরিচিত ছিল। মহাভারত, পুরাণ, জাতকগ্রন্থ দশ কুমার চরিত এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে তাম্রলিপ্ত রাজ্যের উল্লেখ দেখা যায়। গুপ্ত শাসনামলে ফা-হিয়েন এবং পরবর্তী কালে ইৎ সিং তাম্রলিপ্ত পরিভ্রমণ করেন। তাম্রলিপ্ত রাজ্য কখন দণ্ডভুক্তিতে পরিণত হয় তা সঠিক বলা যায় না। দণ্ডভুক্তির অন্তর্গত তাম্রলিপ্ত বন্দর পূর্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ সামুদ্রিক বন্দর ছিল।

কঙ্কগ্রামভুক্তি ঃ কঙ্কগ্রামভুক্তির একমাত্র উল্লেখ দেখা যায় মহারাজ লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর তাম্রশাসনে। এই তাম্রশাসনে মোর বা ময়ূরাক্ষী নদীর উল্লেখ থাকায় মনে হয় কঙ্কগ্রাম ভুক্তি ময়ূরাক্ষীর অববাহিকা অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। এই ক্ষুদ্র ভুক্তিটির কখন সৃষ্টি এবং কখন বিলোপ হয়েছিল তা সঠিক বলা যায় না।

বারক মণ্ডল ঃ ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর কয়েকটি তাম্রশাসনে স্বাধীন রাজ্য হিসাবে বারকমণ্ডলের নাম পাওয়া যায়। প্রধানত দক্ষিণ-মধ্যবঙ্গ বারকমণ্ডল নামে পরিচিত ছিল। সংশ্লিষ্ট তাম্রশাসনসমূহে প্রাগ্-সমুদ্র শব্দটির উল্লেখ থাকায় ধারণা করা যায় যে রাজ্যটি সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

শ্রীহট্টমণ্ডল ঃ প্রাচীন যুগের শাক্তগ্রন্থ যোগিনীতন্ত্রে শ্রীহট্টের উল্লেখ দেখা যায়। প্রধানত সুর্মা কুশিয়ারার দোয়াব অঞ্চল নিয়ে মূল শ্রীহট্টমণ্ডল গঠিত ছিল। হিউয়েন সাঙের বিবরণে 'শিলিচাটালো' নামে যে রাজ্যের উল্লেখ আছে ঐতিহাসিকেরা তার সঙ্গে শ্রীহট্টের অভিন্নতা মনে করেন।

শ্রীহট্টনামের প্রচলনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল বিভিন্ন নামের ভূখণ্ডরূপে উল্লিখিত হয়। রাজা লোকনাথের তাম্রশাসনে (৭ম শতাব্দী) উল্লিখিত সুভ্ভুঙ্গ বিষয় বৃহত্তর শ্রীহট্টের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের নাম। সুভ্ভুঙ্গ বিষয়ের অধিকাংশ অঞ্চল পর্বতময়, অরণ্য-আচ্ছাদিত এবং শ্বাপদসংকুল ছিল।

এই অঞ্চল অটবীখণ্ড নামেও পরিচিত ছিল। ভাস্করবর্মনের তাম্রশাসনে (৭ম শতাব্দী) চন্দ্রপুর বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়। ধারণা করা যায় যে সমস্ত শতাব্দীর আগেই সুভ্ভুঙ্গ ও চন্দ্রপুর এই দুটি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল বিভক্ত ছিল।

চন্দ্রদ্বীপ ঃ চন্দ্রদ্বীপের উল্লেখ মহারাজ শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে পাওয়া গেলেও এর অস্তিত্ব ছিল চন্দ্ররাজবংশীয়দের আগে থেকেই। আড়িয়াল খাঁ এবং মেঘনার মধ্যবর্তী জলবেষ্টিত স্থানেই চন্দ্রদ্বীপের অবস্থান নির্নয় করা যায়। সমতটের উপর চন্দ্রদ্বীপ-রোহিতগিরির রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্র প্রভুত্ব স্থাপন করায় মনে করা যায় যে চন্দ্রদ্বীপ সমতটের নিকটবর্তী ছিল। বিশ্বরূপ সেনের শাসনামলের তাম্রশাসনে বিক্রমপুর ও বঙ্গের সঙ্গে চন্দ্রদ্বীপের উল্লেখ চন্দ্রদ্বীপের অবস্থান নির্ণয়ে সাহায্য করে। পুরাণ গ্রন্থ সমূহে চন্দ্রদ্বীপের বিশেষ উল্লেখ না থাকলেও প্রাচীন বৌদ্ধ মহাযানী গ্রন্থসমূহে চন্দ্রদ্বীপের উল্লেখ আছে। ইসলামি শাসনামলে চন্দ্রদ্বীপ বাকলার (ফরিদপুরের দক্ষিণাঞ্চল ও বরিশালের উত্তরাঞ্চল) সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ নামে পরিচিতি লাভ করে।

কজঙ্গল ঃ দক্ষিণ বিহারের ছোটনাগপুর পার্বত্য অঞ্চলের পূর্বাংশে কজঙ্গল রাজ্যের অবস্থান। আধুনিককালে সাঁওতাল পরগণা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলা নিয়ে প্রাচীন কজঙ্গল রাজ্য গঠিত ছিল। প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থসূত্রে কজঙ্গলের উল্লেখ পাওয়া যায়। অঙ্গুত্তর নিকায় এর (৫/৫৪) সাক্ষ্য অনুসারে ভগবান বুদ্ধ কজঙ্গলে বেশ কিছুদিন অবস্থান করে ইন্দ্রিয় ভাবনাসূত্র নামক উপদেশ প্রচার করেছিলেন। মহাবগ্গ, বিনয়সুত্ত, জাতক গল্প এবং মিলিন্দপণহ গ্রন্থে কজঙ্গলের উল্লেখ আছে। ভগবান বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্যদের স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র স্থানসমূহ পরিদর্শনের জন্য চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং কজঙ্গল পরিভ্রমণ করেছিলেন। □

বাংলাদেশে পুলিশ-ছাত্রলিগ খুন করার পরিকল্পনা তারেকের

সাগরিকা মণ্ডল। ঢাকা॥ বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া কোটা বিরোধী আন্দোলনকে সরকার পতনের আন্দোলনে রূপ দিতে পুলিশ ও ছাত্রলিগ নেতাকর্মীদের খুন করার পরিকল্পনা করেছিল বিএনপি-র সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এই কিলিং অপারেশনে বিপুল অঙ্কের টাকা সে বরাদ্দ করেছিল বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদ। তারেক রহমানের ঘৃণ্য পরিকল্পনার একটি ভয়েস রেকর্ড বাংলাদেশ সরকারের হাতে এসেছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

গত ২৬ জুলাই, শুক্রবার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবে 'দেশ ও স্বাধীনতাবিরোধী সন্ত্রাস-নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের শপথ'-শীর্ষক একটি আলোচনাসভায় আওয়ামি লিগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদ বলেছেন যে তারেক রহমান লন্ডনে বসে কোটা বিরোধী আন্দোলনকে সরকার পতনের আন্দোলনে রূপ দিতে চেয়েছিল। এ জন্য তার দল বিএনপি ও দলটির অধীন অন্যান্য সংগঠনগুলির নেতা ও ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসীদের সে নির্দেশ দিয়েছিল। তার ছক অনুযায়ী চলে একজন ছাত্রলিগ নেতা বা কর্মীকে মেরে ফেললে ৫ হাজার টাকা এবং একজন পুলিশকে মারতে পারলে ১০ হাজার টাকা হত্যাকারীকে পুরস্কার দেওয়া হবে বলে সে নির্দেশও দেয়। ব্যাপক হারে সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস, সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তিতে অগ্নিসংযোগ তারেক রহমানের নির্দেশেই হয়েছে বলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন।

মন্ত্রী আরও বলেন যে তারেক রহমানের ভয়েস সরকারের হাতে এসেছে— সেখানে সে বলছে যে, কার্ফু ভঙ্গ করো, না হলে পদ

ছাড়ো। বিএনপি-র এক নেতা বলেছে— তোমরা আন্দোলনে ঢুকে যাও, নৈরাজ্য সৃষ্টি করো। মন্ত্রী বলেন, এভাবে যে দল দেশের ক্ষতি করতে পারে, তারা কোনো রাজনৈতিক দলই হতে পারে না।

এদিন মন্ত্রী জানান, আজ এমন একটা সময়ে আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছে, যখন দেশের স্বাধীনতা বিরোধীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশন স্থাপিত হয়েছে ১৯৬৪ সালে। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসে বিটিভিতে (বাংলাদেশ টেলিভিশনে) কখনও হামলা, ভাঙচুর হয়নি। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বিটিভির কিছু কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু বিটিভিতে কখনও হামলা হয়নি। দুর্যোগকালীন সময়ে মানুষ যে মন্ত্রণালয়ে ছুটে যায়, সেই ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ে পর্যন্ত ভাঙচুর চালিয়েছে তারা। ঢাকাবাসীর গর্ব, দেশবাসীর গর্ব মেট্রোরেল জ্বালিয়ে দিয়েছে। বিভিন্ন হাইকমিশনারের আইডি হ্যাক করে ভুল বার্তা দিয়ে পোস্ট করা হয়েছে।

তিনি বলেন— আমরা প্রথম থেকেই বলে এসেছি, সর্বোচ্চ আদালতের মাধ্যমে সমাধান হবে। আমরা শেষ পর্যন্ত দেখেছি যে সর্বোচ্চ আদালতের মাধ্যমেই সমাধান হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যা চেয়েছিল, তার থেকে বেশিই পেয়েছে। কোটা থাকলেও সবাইকেই মেধার মাধ্যমে যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয়। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ভুল বোঝানো হয়েছে। যদি শিক্ষার্থীরা একটু ধৈর্য ধরতো, তাহলে বিএনপি-জামায়াত এই সুযোগটা পেত না। খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে— এর পিছনে জঙ্গিগোষ্ঠী যুক্ত হয়েছে কি না।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানান যে বিচারবিভাগীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্তের মাধ্যমে প্রতিটি ঘটনার বিচার নিশ্চিত করার ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যারা সাধারণ মানুষকে হত্যা করেছে, জনগণের সম্পত্তি ধ্বংস করেছে— তাদের প্রত্যেকের বিচার হবে। আমরা এটি করতে বদ্ধপরিকর। ২০১৩ সালে অনেকে ফাঁকফোকর দিয়ে বের হয়েছে, এবার পারবে না।

তিনি বলেন, 'সরকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষক বাহিনীর দ্বারা আন্দোলনকারীদের রক্ষা করেছে। লক্ষ্য করে দেখুন— কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কেউ মারা যায়নি, সব বাইরে হয়েছে। অর্থাৎ, এর সঙ্গে কোটা সংস্কারের দাবির কোনো শিক্ষার্থী জড়িত নয়। সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আশ্বাস দিয়েছেন— কোনো শিক্ষার্থী হয়রানির শিকার হবে না। তিনি শিক্ষার্থীদের সতর্ক থাকতে বলেছেন, যেন তাদের কেউ ব্যবহার করতে না পারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্তিমিত হয়ে যাওয়া কোটা বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি বাংলাদেশ জুড়ে যে নৈরাজ্য চলেছে, তাতে সরকারের ক্ষতির পরিমাণ ১২ হাজার কোটি টাকারও বেশি। ধ্বংস হয়েছে ট্রেন, বাস, সরকারি অফিস, কারাগার, পুলিশ স্টেশন, টোল প্লাজা। এছাড়াও নিহত হয়েছে শতাধিক মানুষ। □

জীবনের নতুন দিশায় আত্মনির্ভরতার সন্ধান

নিজস্ব প্রতিনিধি।। উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর থেকে সম্প্রতি উঠে এসেছে সমবায় আন্দোলনের শক্তির এক সদর্থক প্রতিফলন। সেখানে একটি বাড়িতে ভাড়াটে হিসেবে থাকেন সরিতা উপাধ্যায়। তিনি জীবনে যে সাফল্য অর্জন করেছেন তার আকাঙ্ক্ষা সাধারণ মানুষ মাত্রেই করে থাকেন। একদা প্রতিদিনের জীবন-সংগ্রামে জেরবার সরিতার মাসিক উপার্জন আজ ৪০ হাজার টাকা অতিক্রম করেছে। সাফল্যের পথে তাঁর যাত্রা শুরু চার বছর আগে। ২০২০ সালে করোনা মহামারীর সময় একটি বেসরকারি কারখানায় তিনি কাজ করছিলেন। এমন সময় তাঁর স্বামী তাঁকে ছেড়ে চলে যায়। তখন সরিতার পক্ষে তাঁর তিন সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্ব নির্বাহ করা হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত কঠিন। এই সময় 'মার্গদর্শিকা স্বয়ং সহায়তা সমূহ'-নামক একটি সমবায় সংস্থার সঙ্গে পরিচিত ও যুক্ত হন সরিতা। এই সংস্থা তাঁকে ১০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা করে। এই অর্থের দ্বারা নিজের ঘরেই নানারকম খাবার তৈরি এবং রান্না করা খাদ্যদ্রব্য প্যাকেটজাত করে সরবরাহ করার কাজ শুরু করলেন তিনি। তাঁর স্থাপিত এই ব্যবসায়িক উদ্যোগের নাম দিলেন— 'মাঁ কী রসোই' (মায়ের রান্নাঘর)। বিভিন্ন দোকানদার, ছাত্র-ছাত্রী ও হাসপাতালে সরিতার তরফে চলতে থাকে রান্না করা খাবার সরবরাহ। বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার কাজে যুক্ত হয় তাঁর সন্তানরাও। গোড়ার দিকে কাজটি কঠিন হলেও রান্না করা খাবারের মান অত্যন্ত ভালো হওয়ায় খাবারের নিয়মিত গ্রাহক বাড়তে থাকে।

এই বিষয়ে সরিতা জানান, 'এই সমবায় সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর দারিদ্র্যের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি। যতটা পরিশ্রম প্রতিদিন করি, সেই অনুযায়ী এখন উপার্জন করতে পারি। খাবার পৌঁছে দেওয়ার জন্য সুইগি ও জোম্যাটোর মতো সংস্থার সাহায্যও নিই।' আর্থিক সক্ষমতা অর্জনের জন্য গত ১০ জুন সরিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র লক্ষ্ণৌতে একটি ছোটো রেস্টুরেন্ট চালু করতে পেরেছেন।

২০২০ সালে করোনা মহামারীর সময়েই এই স্বয়ং সহায়তা সংস্থাটি শুরু হয়। সংস্থাটির অধ্যক্ষা— মীনাক্ষী রাই। এই সমবায়ের শুরুর দিক সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি যা বললেন তা যথেষ্ট প্রেরণাদায়ক। তিনি বলেন যে করোনা মহামারী চলাকালীন বহু লোক বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। পরিযায়ী শ্রমিকরা এই সময়ে তাদের বাড়ি ফিরতে থাকেন। রোজগার বন্ধ হয়ে তাঁরা কর্মহীন হয়ে পড়েন। নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর অভাবে বহু ঘরে রান্না পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। খাদ্যাভাবে এই লোকজনের পাশে দাঁড়াতে গোরক্ষপুরের কিছু সামাজিক কার্যকর্তা এগিয়ে আসেন। স্থানীয় যুবকদের সাহায্যে খাদ্যাভাব-পীড়িত ঘরগুলিতে তাঁদের তরফে পৌঁছে দেওয়া হতে থাকে খাদ্যসামগ্রী। পরবর্তী পর্যায়ে কর্মসংস্থানহীন এই পরিবারগুলির রোজগারের বিষয়টিও ভাবনাচিন্তা করা হয়।

এখনও পর্যন্ত গোরক্ষপুরের ৪০০ জনেরও বেশি মহিলা এই সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তারা সবাই নানান সামগ্রী তৈরির সঙ্গে যুক্ত। কাঁচা লঙ্কার আচার তৈরির মশলা, টেরাকোটার অলংকরণ, ব্যাগ বা থলি প্রভৃতি জিনিসপত্র তাঁরা তৈরি করে চলেছেন। সমবায়ের সহায়তায় অনেকে দোকান চালু করতে পেরেছেন। কেউ সাজগোজের সামগ্রী বিক্রি করেন, কেউ বিউটি পার্লার খুলেছেন।

বিভিন্ন স্থানে সংস্থার কাজ ঠিকভাবে পরিচালনার জন্য এই সমবায় সংস্থার একাধিক উপসমূহ রয়েছে। প্রতিটি উপসমূহের অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন ১০ জন মহিলা। এই সদস্যরা প্রত্যেকে ২০০ টাকা করে প্রতি মাসে সংস্থায় জমা করে থাকেন। অর্থাৎ, প্রতিটি উপসমূহে প্রতি মাসে দু'হাজার টাকা করে জমা হয়। এই অর্থ থেকেই কোনো কাজে আগ্রহী ও উৎসাহী মহিলাদের আর্থিক সহায়তা করা হয়ে থাকে। সংস্থার সদস্যদের যে টাকা সহায়তা বা ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়, তাদের থেকে তার জন্য কোনো সুদ নেওয়া করা হয় না। প্রতি মাসে ১০০-৫০০ টাকা কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের বিষয়টি অবশ্য বেঁধে দেওয়া হয়। এই মাসিক কিস্তিতেই মহিলারা ঋণ পরিশোধ করে থাকেন এবং সেই অর্থ জমা হয়ে তার থেকেই অন্যান্যদের আর্থিক সহায়তা দান চলতে থাকে।

সমবায় সংস্থার সহায়তার মাধ্যমে দারিদ্র্য ও দুরবস্থা জয় করে আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জন করা সরিতা উপাধ্যায় সব পরিবারের সামনে আজ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ। ▮

বালক রবি

ঢং-ঢং-ঢং.....। বেজে উঠল দেউড়ির ঘড়ি। ঘড়ির কাঁটায় এখন সকাল সাতটা। ছোটো ছোটো ছেলেরা বই নিয়ে, শ্লেট নিয়ে টেবিলের সামনে গিয়ে বসেছে। নীলকমল মাস্টার শুরু করেছেন অঙ্ক করানো।

রোজকার মতো আজও একটা ছেলের পড়ায় মন নেই। সে উঁকি দিয়ে দেখছে, বারান্দার এক কোণে বসে নেয়ামত দর্জি মনের সুখে সেলাই করছে। বালক দেখছে, নীচে দেউড়ির সামনে বসে আছে চন্দ্রভান। লম্বা দাড়িটা কাঠের কাঁকই দিয়ে আঁচড়িয়ে নিচ্ছে। তার পাশে বসে আচে ছিপছিপে ছোকরা দারোয়ান। বসে বসে তামাক কুটছে। সকালবেলায় ওইখানেই ঘোড়াটি বালতিতে দেওয়া দানা খেয়ে গেছে। আর অনেক কাক এসে জড়ো হয়েছে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া ছোলা ঠোকরানোর জন্য। জনি কুকুরটা তাই দেখে ডেকে উঠছে।

পড়াতে বালকের একেবারেই মন নেই। ন'টা বাজলে শেষ হয় নীলকমল মাস্টারের পড়ানো। তারপর সেই গোবিন্দের সঙ্গে ঘাটে স্নান করতে যায়। সাড়ে ন'টা বাজলে রোজদিনের এক খাবার— ডাল ভাত মাছের ঝোল। খেয়ে খেয়ে অরুচি হয়ে গেছে বালকের। তারপর দশটা বাজামাত্রই ফেরিওয়ালাদের আনাগোনা শুরু হয়। কাঁচা আমওয়ালা, কাচের চুরিওয়ালা, বাসনওয়ালা, সবার মন উদাস করা ডাক শোনা যেত।

ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াত বাড়ির সামনে, বালক তাতে চেপে স্কুলে যেত। স্কুলে যেতে তার মোটেও ভালো লাগে না। নর্মাল স্কুল। শ্রেণীকক্ষে বসে বালকটি কবিতা লিখতো আপন মনে। বাড়ির গৃহশিক্ষক সাতকড়ি দত্ত মহাশয়ের নজর পড়ে বালকটির প্রতি। মাস্টারমশাই বালককে জিজাসা করেন, ' হ্যাঁরে, তুই নাকি আজকাল কবিতা লিখিস?' কোনো উত্তর নেই। তিনি বালককে একটি কাগজে দু'লাইন কবিতা লিখে বালকের হাতে দিয়ে ছন্দ মিলিয়ে দু'লাইন লিখতে বললেন। সাতকড়িবাবু লিখেছিলেন,

'রবি করে জ্বালাতন আছিল সবাই,
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।'

বালকটি সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেলল,

' মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে,
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।'

কবিতা শুনে মাস্টামশাই গদগদ স্বরে বলেছিলেন, 'তোর হবে।' সার্থক হয়ে উঠেছিল মাস্টারমশাইয়ের ভবিষ্যদ্‌বাণী।

এই বালক হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শুধু কবিতা নয়, গান, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক লিখে ভরিয়ে দিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার। বেশি দিন স্কুলে যাননি তিনি। তবে তিনি যা প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন, তাতে সারা বিশ্ব অবাক হয়ে গিয়েছিল। ১৯১৩ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। ৮৩ বছর আগে ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট, বাংলা ১২৬৮ সালের ২২শে শ্রাবণ পরলোকে পাড়ি দিয়েছেন। কিন্তু আজও তিনি বেঁচে আছেন প্রতিটি বাঙ্গালি, প্রতিটি ভারতবাসী এবং বিশ্ববাসীর হৃদয়ে। তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কবি দীনেশ দাশের কবিতার সুরে বলতে ইচ্ছা করে—

'তোমার পায়ের পাতা
সবখানে পাতা,
কোনখানে রাখব প্রণাম।'

রূপসা রায়, নবম শ্রেণী

পর্বত পরিচয়

কোড়ো পাহাড়

বাঁকুড়া শহর থেকে মাত্র ১৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কোড়ো পাহাড়। সবুজ গাছপালায় ঢাকা ছোট্টো পাহাড়। উচ্চতা ৫০০ ফুট। পাহাড়ের এক পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে শালি নদী। লালমাটির পাকদণ্ডী পথ ধরে বড়ো বড়ো পাথরের চাঁই ডিঙিয়ে উঠতে হয় পাহাড়ের মাথায়। পাহাড়ের চূড়ায় রয়েছে অষ্টভুজা পার্বতী মন্দির। তার পাশে রয়েছে মহিমানন্দ তপোবন আশ্রম।

এসো সংস্কৃত শিখি– ৩৩

আবশ্যকম্, মাস্তু, পর্যাতম্, স্বীকরোতু, ধন্যবাদ:, স্বাগতম্

(প্রয়োজন, প্রয়োজন নেই, যথেষ্ট, গ্রহণ করুন, ধন্যবাদ, স্বাগত)

অভ্যাস করি--১

পিপাসা অস্তি। জলম্ আবশ্যকম্।

ক্ষুধা অস্তি। ভোজনম্ আবশ্যকম্।

উষ্ণতা অস্তি। ব্যজনম্ আবশ্যকম্।

পরীক্ষা অস্তি। পঠনম্ আবশ্যকম্।

অভ্যাস করি--২

ফলম্ আবশ্যকম্। পুষ্পম্ আবশ্যকম্। জীবননম্ আবশ্যকম্। জ্ঞানম্ আবশ্যকম্।

প্রয়োগ করি--

কিং কিম্ আবশ্যকম্? ফলম্, বলম্, ঐশ্বর্যম্, যৌবনম্, মিত্রম্, যন্ত্রম্, বস্ত্রম্।

ভালো কথা

অলস পাখি

আমার একটা নতুন অভিজ্ঞতার কথা নবাঙ্কুরের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করছি। এতদিন শুনে এসেছি কোকিল বাসা বানাতে পার না। কাকের বাসায় ডিম পাড়ে। কাক খাইয়েদাইয়ে বড়ো করার পর যখন চিনতে পারে, তখন তাড়িয়ে দেয়। সেদিন দেখলাম অন্যরকমও হয়। একটা কোকিলছানা গাছের ডালে বসে আছে আর দুটো শালিক ঠোঁটে করে খাবার এনে কোকিলছানাকে খাওয়াচ্ছে। কোকিলছানাটি এক জায়গাতেই বসে আছে, শালিক দুটিই খাবার খাইয়ে দিচ্ছে। আমার ঠাকুমা বললেন, পাখির মধ্যে কোকিল খুব অলস। যে পাখির বাসায় সুযোগ পাবে সেখানেই ডিম পেড়ে রাখে।

নীলাঞ্জন রায়, নবমশ্রেণী, ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগনা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

মাথায় হাত

আদিত্য পাল, সপ্তম শ্রেণী, বড়জোড়া, বাঁকুড়া।

বর্ষাকালের বেশিরভাগটা
চলে গেল ভাই
কৃষকেরা সব হা পিত্যেশ
বর্ষার দেখা নাই।

কৃষককুলের মাথায় হাত
চাষ কেমনে হবে
চাষ না হলে সংসারটা
চলবে কেমন করে?

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

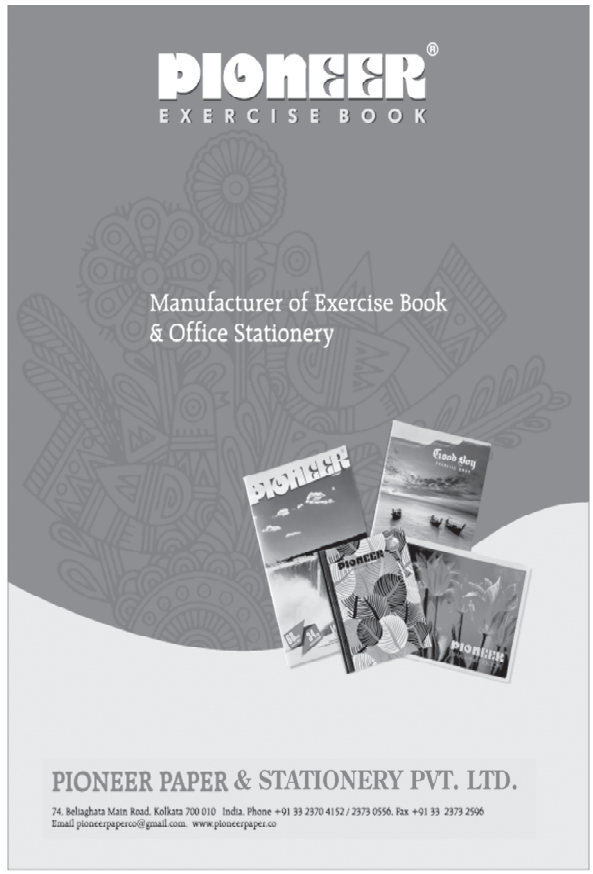

With Best Compliments from -

A
Well wisher

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৈষ্ণব পদাবলির মধ্যেও নিজেকে আবিষ্কার করেছিলেন

স্বপনকুমার মণ্ডল

প্রতিভার ধর্মই প্রকাশের আলো খুঁজে নেওয়া। সেখানে প্রতিভাশালীদের আত্মপ্রকাশের তীব্রতা অত্যন্ত স্বাভাবিকই নয়, প্রত্যাশিতও। শুধু তাই নয়, বিচিত্র পথে তার চলন, বিচিত্র ভাবে তার প্রকাশ। এ কারণে আত্মপ্রকাশের তার যাত্রা শেষ হয়ে যায় না, আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই তার অভিযান এগিয়ে চলে। সেখানে যে তার অসপত্ন অধিকার, তার নাছোড় মনোভাবে তা সময়ান্তরেই বেরিয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, সেখানে অস্বাভাবিকতা বোধ বা অসাধ্যসাধনের চেতনার চেয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠা করার সদিচ্ছাও অত্যন্ত স্বাভাবিক। স্বাভাবিকভাবে সেই শ্রেষ্ঠত্ববোধে যেমন আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিবিড়তা লাভ করে, তেমনই তার উন্নাসিক মানসিকতাও নানাভাবে জেগে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেড়ে ওঠা, গড়ে তোলা জীবনেও তা লক্ষণীয়। তাঁর অতুলনীয় বিরল প্রতিভার প্রকাশের ক্ষেত্রেও আত্মপ্রতিষ্ঠার অতি সক্রিয়তা থেকে উন্নাসিকতাবোধে বিরূপ সমালোচনাও সক্রিয় হয়েছিল। বহুমুখী প্রতিভার প্রকাশের আয়োজনে তাঁর সুগভীর অধ্যবসায় ও আত্মসচেতনতা বিস্ময়কর। রীতিমতো জেনে-বুঝে তাঁর সাহিত্যসাধনার বিস্তার।

শুধু তাই নয়, প্রথম থেকেই তাঁর উঁচু তারে বাঁধা মন শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়ে তাঁর নিরন্তর অধ্যবসায় ও অনুশীলন অল্প বয়সেই তাঁকে পরিণতমনস্ক করে তুলেছিল। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তাঁর আত্মপ্রকাশে নিজেকে পরখ করার জন্য অতি সক্রিয়তার কথা বললেও তাতে তাঁর কৈশোরকালের পরিচয় ব্রাত্য হয়ে পড়ে না, বরং প্রকাশের আভিজাত্যে তাঁর অসাধারণ মনীষাকে আরও বেশি করে চিনিয়ে দেয়। সেখানে বৈষ্ণবপদাবলির মধ্যেও তাঁর স্বকীয় সত্তা ভানুসিংহ ঠাকুরের নামে আত্মাবিষ্কারে বাংলা সাহিত্যে শুধু অভিনব ও অদ্বিতীয় সৃষ্টি-ফসল উপহার দেয়নি, আত্মপরিচয়েও বনেদি আভিজাত্য গড়ে তুলেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম সাড়া জাগানো জনপ্রিয় কাব্যের নাম 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১৮৮৪) এবং তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় ছদ্মনাম ভানুসিংহ। অথচ আপনাকে পরখ করতে গিয়েই কবি ঐতিহ্যপ্রাচীন বাঙ্গলার বৈষ্ণব পদাবলিতে নিজেকে শামিল করেছিলেন। তার মধ্যে যে শুধু প্রমাণের সদিচ্ছাই ছিল না, নিজেকে খুঁজে পাওয়ার সাধনাও যে সক্রিয় ছিল, তাও অচিরেই প্রকাশ পায়। সেখানে রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় প্রতিভার সঙ্গে তাঁর নিরন্তর সাধনার হরগৌরীয় একাত্মতা আপনাতেই বিস্ময় সৃষ্টি করে।

আসলে প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে স্বকীয় প্রতিভা প্রকাশের আয়োজন তাঁর প্রয়োজনকে অনায়াসেই ছাপিয়ে যায়। একইসঙ্গে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার প্রকাশে নিরবচ্ছিন্ন ধারা লক্ষণীয়। শুধু তাই নয়, আত্মবিশ্বাসের প্রাবল্যে তাঁর মধ্যে অতীতের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশিত হলেও তাতে তাঁর হীনম্মন্যতার অবকাশ ছিল না। অন্যদিকে তাঁর সেই ঐতিহ্যকে অতিক্রম করে অভিনব সৃষ্টি প্রয়াসও জারি ছিল আজীবন। সেক্ষেত্রে

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাদীপ্ত আত্মবিশ্বাসের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই শ্রেষ্ঠত্ববোধে তাঁর উন্নাসিকতার ছায়া কায়া বিস্তার করে। তাতে যেমন তাঁর আত্মবিশ্বাসের ঘটাও আছে, তেমনই তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যও সক্রিয় ছিল। সেখানে সৃষ্টিতে তাঁর ঘটার ফোঁটাই আত্মপ্রতিষ্ঠার বিজয়তিলকে রূপান্তরিত হওয়ায় প্রতীক্ষা করে। এজন্য রবীন্দ্রনাথের মধ্যে স্বরচিত পথে চলার প্রয়াস প্রথম থেকেই সচল ছিল। অনুকরণ বা অনুসরণ নয়, অচিরেই তাঁর স্বকীয় পথেই অভিযান এগিয়ে চলে। শুথু তাই নয়, সেখানে অচিরেই তাঁর বিখ্যাত হওয়া বা শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন হওয়ার সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসে কোনো ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না। সেক্ষেত্রে তাঁর সাধ ও সাধনার মধ্যে যেমন দূরত্ব ছিল না, তেমনই আত্মপ্রকাশ থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্যেও বিরতি ঘটেনি। বরং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে স্বরচিত পথে বিস্তারের মধ্যেই তাঁর অসাধরণত্বের পরিচয় নিবিড়তা লাভ করে। এজন্য নিজেকে খুঁজে পাওয়াতেই তাঁর সাধনা নিঃস্ব হয়ে পড়েনি, বরং তাতে উত্তরণ থেকে উৎকর্ষে পৌছানোই তাঁর লক্ষ্য হয়ে ওঠে। সেখানে বৈষ্ণব পদাবলিকেই রবীন্দ্রনাথ অভিনব পদাবলিতে শুধু পরিণত করেননি, পদের প্রাচীনত্বকেই আধুনিক কবিতার বনেদি আভিজাত্যেও রাঙিয়ে তুলেছেন। অথচ তা করেছেন একান্ত আপন করে, কৃত্রিম ভাষাকেও দিয়েছেন আধুনিকতার ছোঁয়া। এজন্য 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'কে তাঁর সৃষ্টিসম্ভারে সযত্নে লালন করেছেন আজীবন।

বয়সের তুলনায় যেভাবে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীলতার প্রাচুর্য ও আভিজাত্য নিয়ে চর্চার পরিসর সক্রিয়তা লাভ করে, সেভাবে তাঁর অধ্যবসায় বা অনুশীলনের কথা উঠে আসে না। সেখানে তাঁর প্রতিভার অনন্য ও অতুলনীয় বিস্তারে সবকিছু মেনে নেওয়ার প্রবণতায় তার বয়সের অতিরিক্ত পাঠাভ্যাসের কথা উপেক্ষিত হয়ে পড়ে। অথচ রবীন্দ্রনাথের বিরল প্রতিভার নেপথ্যে তাঁর গভীর অধ্যবসায়ের অসাধারণ ভূমিকাও অনস্বীকার্য। ছোটোবেলা থেকে গৃহশিক্ষকের কাছেই শুধু পড়াশোনা নয়, নিজে থেকেই তাঁর সাহিত্যপাঠের নিবিড় আয়োজন বহুধাবিস্তৃত ছিল। শুধু তাই নয়, তাঁর গভীর পঠনশীলতাই তাঁর অন্তর্দৃষ্টিকে আরও তীব্র করে তোলে। সেখানে বৈষ্ণব পদাবলির প্রতি তীব্র অনুরাগ শুধু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি পড়েই তিনি গড়ে তোলেননি, জয়দেব পড়েছেন, অন্য পদকর্তাতেও পৌঁছেছিলেন। শ্রেষ্ঠত্ববোধে তাঁর লক্ষ্যে সাহিত্যের রথী-মহারথীর অসাধারণত্বের আলোয় নিজেকে খুঁজে ফেরার সক্রিয়তা তাঁকে সদা সচল রেখেছিল। তাঁর উন্নাসিকতার মধ্যে শুধু আত্মজাহিরের আয়োজন ছিল না, নিজেকে মিলিয়ে নেওয়ার সদিচ্ছাও সক্রিয় ছিল। তাঁর বিরূপ সমালোচনার মধ্যেও সেই গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় মেলে। স্বাভাবিকভাবেই তাতে তাঁর সমালোচনায় তুলনা বা প্রতিতুলনার অবকাশে শ্রেষ্ঠত্বের চেতনা আপনাতেই সক্রিয়তা লাভ করে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীলতার ধারাতেই তাঁর সমালোচনার ধারা অব্যাহত থাকে। সেখানে তাঁর সৃষ্টির নেপথ্যে তাঁর গভীর অধ্যবসায় ও অনুধ্যানের পরিচয় বেরিয়ে পড়ে।

মাত্র ষোলো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ অভিনব বৈষ্ণব পদাবলি লেখায় ব্রতী হয়েছিলেন। তারও বছরদুয়েক আগে থেকেই তাঁর পড়াশোনা শুরু হয়েছিল। সেক্ষেত্রে তাঁর আত্মাবিষ্কারের সোপানে তাঁর মধ্যে বহুমুখী বিস্তার যেমন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল, তেমনই স্বকীয় পথের সন্ধানে তাঁর অতীতকে অতিক্রমের প্রয়াসও জারি থাকে। সেখানে যেমন শ্রেষ্ঠত্ববোধে অনেকের প্রতি রবীন্দ্রনাথের তীব্র অনুরাগ ও শ্রদ্ধাবোধ জেগে ওঠে, তেমনই তাতে তাঁর উন্নাসিকতাও বেরিয়ে পড়ে কৃতীদের তুলনা বা প্রতিতুলনার অবকাশে। সেক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টির বহুমুখী নিবিড় আয়োজনের পাশাপাশি তাঁর মননের বহুধাবিস্তৃত মূল্যায়ন একইভাবে স্বকীয় অস্তিত্বকে প্রকাশ করে চলেছিল। তাঁর বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত মাসিক 'ভারতী' পত্রিকায় (প্রথম প্রকাশ ১২৮৪-এর শ্রাবণ/১৮৭৭) রবীন্দ্রনাথের নিয়মিত লেখার মধ্যেও তার পরিচয় বর্তমান। তাতে কবিতার পাশাপাশি তাঁর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'ভারতী'র প্রথম সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর সুদীর্ঘ প্রবন্ধের প্রথম কিস্তি বেরিয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মধুসূদন দত্ত তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর জন্য বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাটি প্রকাশের বছরতিনেক আগে (১৮৭৩) তাঁর প্রয়াণ ঘটে। স্বাভাবিকভাবেই খ্যাতির প্রতি কিশোর রবীন্দ্রনাথের হীনম্মন্যতাবোধজাত বিরূপ সমালোচনার নেপথ্যে তারুণ্যের সহজাত স্পর্ধার কথা বছরপাঁচেক পরে (১৮৮২) বললেও তার মধ্যে তাঁর তীব্র অস্মিতাবোধের উগ্রতাকে অস্বীকার করা যায় না। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রতিভাজাত ঈর্ষা নানাভাবেই উৎকর্ষবোধে উঠে এসেছে। সেখানে প্রশংসার ছলেও তাঁর স্বকীয় অস্তিত্ব নানাভাবেই মুখর। মহাকবি কালিদাসের কথা প্রসঙ্গেও তাঁর নিজের কথা প্রাধান্য পেয়েছে। 'ক্ষণিকা'র (১৯০০) 'সেকাল' কবিতার শেষ স্তবকের সূচনায় অকপটে কবি জানিয়েছেন, : 'আপাতত এই আনন্দে/গর্বে বেড়াই নেচে—/কালিদাস তো নামেই আছেন,/আমি আছি বেঁচে।' রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মধ্যেই তাঁর অস্মিতাবোধের পরিচয় নানাভাবে উঠে এসেছে।

অন্যদিকে সেবছর (১২৮৪) 'ভারতী'র আশ্বিন সংখ্যাতেই তাঁর 'ভানুসিংহের কবিতা' শুরু হয় 'সজনী গো— শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা'। দ্বিতীয় কবিতা বেরোয় অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। সেই কবিতাটি লেখার আনন্দ রবীন্দ্রনাথ আজীবন বহন করেছেন। এও যেন তাঁর 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এর মতো সৃষ্টির আনন্দ বয়ে এনেছিল। 'জীবনস্মৃতি'তে (১৯১২) সেকথা অকপটে জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ : 'একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলা দিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটি শ্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে'। লিখিয়া ভারী খুশি হইলাম।' সেই খুশিতে সেবছর মোট সাতটির সঙ্গে পরে আরও ছয়টি এবং 'ছবি ও গান'-এর অন্তর্ভুক্ত আর দুটি মিলে পনেরোটির সঙ্গে আর নতুন করে লেখা ছয়টি মিলে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'

১২৯১ তথা ১৮৮৪-তে প্রকাশিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতিতে নতুন মাত্রা লাভ করে। কাব্যটি পরে আরও সংযোজন-বিয়োজন করা হয়।

অন্যদিকে তার আগে তাঁর বিশ বছরের মধ্যে যেসব কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে যে কবিপরিণতির পরিচয় সমুন্নত ছিল না, তা রবীন্দ্রনাথের পুনর্মুদ্রণের অনীহাবোধেই স্পষ্ট মনে হয়। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বরমাল্য পাওয়া 'সন্ধ্যাসংগীত' কাব্যটিকেও বাদ দিতে চেয়েছিলেন কবি। সেক্ষেত্রে তাঁর 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' যে তাঁর কাব্যধারায় প্রথম উৎকৃষ্ট ফসল, সেকথাও স্বয়ং কবির অভিপ্রায়েই প্রতীয়মান। ১৯৪০-এও কাব্যটির নতুন সংস্করণের ভূমিকা লিখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মপ্রত্যয়কে নানাভাবে তুলে ধরেছেন। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের আত্মাবিষ্কারে বৈষ্ণব পদাবলির প্রতি তাঁর তীব্র অনুরাগ বিশেষভাবে স্মরণীয়। চোদ্দো বছর বয়সেই রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে একাত্ম হতে শুরু করেন।

সেই সময় 'সাধারণী' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয় সরকার, সারদাচরণ মিত্র ও বরদাকান্ত মিত্রের সম্পাদনায় ১২৭১-এর অগ্রহায়ণ মাস থেকে প্রতি মাসে ধারাবাহিকভাবে 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' নামে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখের পদাবলী প্রকাশিত হতে থাকে। তাতে বিদ্যাপতির ব্রজবুলি ভাষায় লেখা বৈষ্ণব পদাবলী টীকা-সহ প্রকাশিত হয়। সেখানে বিদ্যাপতির অচেনা-অজানা ভাষায় লেখা পদগুলি রবীন্দ্রনাথের মনে তীব্র আকর্ষণের বিষয় হয়ে ওঠে। জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের সৌজন্যে পাওয়া বিদ্যাপতির পদগুলি তাঁর রীতিমতো গবেষণা ও সাধনার ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে 'ভানুসিংহের কবিতা'য় সেকথা অকপটে জানিয়েছেন। সেই 'প্রাচীন-কাব্যসংগ্রহ সেসময়ে' তাঁর কাছে 'লোভের সামগ্রী' হয়ে উঠেছিল।

গুরুজনদের পাঠের অভাববোধে সেগুলো অনায়াসেই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে জোগাড় করা সহজ হয়েছিল, কিন্তু আত্মস্থ করা সহজ ছিল না। সেখানে রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় উদ্যোগেই তাঁর অসাধারণত্ব নিবিড়তা লাভ করে। তাঁর কথায় (প্রশান্তকুমার পালের 'রবিজীবনী'র প্রথম খণ্ডে 'জীবনস্মৃতি'র পাণ্ডুলিপির পাঠে) : 'বিদ্যাপতির দুর্বোধ বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত। আমি টীকার উপর নির্ভর করিয়া নিজে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। বিশেষ করে দুরূহ শব্দ যেখানে যতবার ব্যবহৃত হইয়াছে সমস্ত আমি একটি ছোটো বাঁধানো খাতায় নোট করিয়া রাখিতাম। ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলিও আমার বুদ্ধি অনুসারে যথাসাধ্য টুকিয়া রাখিয়াছিলাম।' সেই সব প্রস্তুতির পটভূমিকায় খাতাটির কথা সুদীর্ঘকাল পরেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসে ১৯৪০-এর 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র ভূমিকায় পুনরায় স্মরণ করেছেন।

শুধু তাই নয়, আরও জানিয়েছেন : 'পরবর্তীকালে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ যখন বিদ্যাপতির সঠিক সংস্করণ প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হলেন তখন আমার খাতা তিনি সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেলে সেই খাতা তাঁর ও তাঁর উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে ফিরে পাবার অনেক চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারিনি। যদি ফিরে পেতুম তাহলে দেখাতে পারতুম কোথাও কোথাও যেখানে তিনি নিজের ইচ্ছামতো মনে করেছেন ভুল করেছেন। এটা আমার নিজের মত।' সে মতেই রবীন্দ্রনাথের সততা ও নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠাই নয়, প্রতিভাদীপ্ত অস্মিতাবোধও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে 'ভানুসিংহের কবিতা'র মধ্যে যে তাঁর কবিখ্যাতির সচেষ্ট প্রয়াস ছিল, সে কথাও তার অব্যবহিত অনুচ্ছেদের সূচনায় 'পদাবলীতে জালিয়াতি'র কথা পুনরায় তুলে ধরাতেই প্রতীয়মান।

সাফল্যবোধের উৎকর্ষে ঋণস্বীকারের কথা প্রকাশমুখর হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর ভানুসিংহ ঠাকুরের কবিতার উৎকর্ষবোধে তার রচনা প্রসঙ্গে অনেকের ঋণের কথা অকপটে বলেছেন। তাঁর অকপট স্বীকারোক্তিতে মনে হয় যেন তাঁদের সংযোগেই তাঁর এই বিরল কৃতিত্বের প্রকাশ সহজসাধ্য হয়েছিল। আসলে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিনয়ের অভিনয় ছিল না। বরং সত্যপ্রকাশে তাঁর স্পষ্টবাক্‌মূর্তি আপনাতেই শ্রদ্ধা আদায় করে নেয়। সেখানে বৈষ্ণব পদাবলিতে তাঁর স্বকীয় ভূমিকার মধ্যে জালিয়াতির ছায়া কীভাবে বিস্তার হয়েছিল, তা নিয়ে দ্বিধাহীন প্রকাশের মধ্যেই আসল পরিচয় বেরিয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের কাব্যালোচনায় সুহৃদ তথা জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের সহপাঠী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর কাছে ইংল্যান্ডের বালককবি টমাস চ্যাটার্টনের (১৭৫২-৭০) প্রাচীন কবির মতো নকল কবির বিপুল খ্যাতির কথা শুনেছিলেন। সেই চ্যাটার্টনের কবিখ্যাতির মোহে পড়ে রবীন্দ্রনাথও তাঁর পথ অনুসরণ করেছিলেন। 'জীবনস্মৃতি'-তেও জানিয়েছেন : 'চ্যাটার্টন প্রাচীন কবিদের এমন নকল করিয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন যে অনেকেই তাহা ধরিতে পারেন নাই। অবশেষে ষোলো বছর বয়সে সেই হতভাগ্য বালককবি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। আপাতত ওই আত্মহত্যার অনাবশ্যক অংশটুকু হাতে রাখিয়া, কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।' অথচ রবীন্দ্রনাথ তাঁর ষোলো বছর বয়সেই বালককবির 'জালিয়াতি'র শরিক হওয়ার কথা রসিকতা করে বলেছেন, তাও অচিরে তিনিই ফাঁস করে দেন। সেখানে তাঁর 'জালিয়াতি'র মধ্যেই নকলের আভিজাত্য নেই, আসলের অসাধারণত্ব প্রকট হয়ে ওঠে।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম- ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

মাঝখান থেকে বঙ্গের পণ্ডিতমহলের ফাঁক ও ফাঁকি নিয়ে তাঁর রসিকতায় চূড়ান্ত ব্যঙ্গবিদ্রূপও আন্তরিক হয়ে ওঠে। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ বালককবি চ্যাটার্টনের পঞ্চদশ শতকের প্রাচীন কবি টমাস রাউলির কবিতার মতো নকল করে কবিখ্যাতি লাভে সচেষ্ট হননি। বালককবির মতো তাঁর কবিতার প্রতি পাঠকবিমুখতা বা কবিখ্যাতির অভাববোধ তাঁর ছিল না। সেদিক থেকে বারো-তেরো বছর বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যচর্চা প্রকাশের আলো খুঁজে পায়, অচিরেই একাধিক সাময়িক পত্রিকায় তাঁর সাহিত্যচর্চা বিস্তার লাভ করে। সেদিক থেকে চ্যাটার্টনের হীনম্মন্যতা রবীন্দ্রনাথের ছিল না। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহ ঠাকুর কোনো প্রাচীন কবি নন। সেটি তাঁরই ছদ্মনাম। শুধু তাই নয়, তিনিই যে ভানুসিংহ সেকথাও রবীন্দ্রনাথ জানিয়ে দেন। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বালককবির ছায়া নেই, তবে রসিকতা আছে।

আসলে রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহ ঠাকুরের ছদ্মবেশ ধারণের মাধ্যমে তাঁর কবিসত্তার উৎকর্ষকে পরখ করতে চেয়েছিলেন। সেখানে বিদ্যাপতির বৈষ্ণব পদাবলির ব্রজবুলির মতো বাংলা ও মৈথিলীর কৃত্রিমতাজাত মিশ্রভাষার রহস্যময় প্রকৃতির প্রতি তীব্র অনুরাগে তাঁর স্বকীয় প্রতিভায় নতুন করে কবিতা রচনার মধ্যে যেমন তার পাঠযোগ্যতায় প্রাচীনত্বের সৌরভ জরুরি, তেমনই তার সাফল্যে কবির কৃতিত্ব প্রতীয়মান। স্বাভাবিকভাবেই প্রথমের বাস্তবায়নের ভিতেই দ্বিতীয়'র আবির্ভাব নির্ভর করায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই ভানুসিংহের প্রাচীনত্ব বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্বীয় কবিত্বের পরিচয়কে পরখ করতে চেয়েছিলেন, তা তাঁর দুর্বলতা নয়, বরং অনেকবেশি সবলতার পরিচয়। প্রথমে ভানুসিংহের প্রাচীনত্বের আধারে তাঁর কবিতার গ্রহণযোগ্যতা বিস্তারের আয়োজন চলে। লাইব্রেরিতে খুঁজে খুঁজে বহু পুরনো জীর্ণ পুঁথি থেকে প্রাচীন কবি ভানুসিংহের কবিতা 'কপি করিয়া' আনার কথা বলে প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে আগ্রহী বন্ধুকে দেখিয়ে বিশ্বাস করানোর প্রয়াসী হয়েছিলেন কিশোর কবি।

এতে সেই বন্ধুর ভানুসিংহকে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের চেয়েও বড়ো কবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর কাছে ধরা দেন। তাতে অবশ্য প্রশংসা শংসায় এসে ঠেকে। বন্ধুটির 'নিতান্ত মন্দ হয়নি' নামমাত্র মূল্যায়ন স্বাভাবিক হয়ে আসে। অন্যদিকে 'ভারতী'তে প্রকাশকালেই জার্মানির প্রবাসী ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোয়াপাধ্যায় ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে এদেশের গীতিকাব্যের তুলনা করে যে চটি বই লিখেছিলেন, তার মধ্যে ভানুসিংহকে 'প্রাচীন পদকর্তারূপে' 'প্রচুর সম্মান দিয়েছিলেন' যা 'কোনো আধুনিক কবির ভাগ্যে সহজে জোটে না' বলে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'জীবনস্মৃতি'তে জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, 'এই গ্রন্থখানি লিখিয়া তিনি ডাক্তার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।'

আসলে রবীন্দ্রনাথ যে ভানুসিংহের কবিতা লিখে ভানুসিংহের কৃতিত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছিলেন, সেকথা শুধু প্রকাশের উৎকর্ষেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ফলাও করে বলেননি, তার মধ্যে তাঁর আত্মপ্রকাশের অভিনব আয়োজনের সার্থকতাও ছিল। যা বালককবি চ্যাটার্টন প্রাচীন কবির আড়ালে থেকেই কবিখ্যাতি নিঃস্ব করে ফেলেছিলেন, তাই রবীন্দ্রনাথ স্বকীয় কবিপ্রতিভায় প্রাচীন কবিকে আধুনিকতায় নবজন্ম দিয়েছেন। সেখানে তাঁর সচেতন সাধনা ও সৃষ্টির অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী যিনি চ্যাটার্টনের কথা রবীন্দ্রনাথকে অল্পবিস্তর জানিয়েছিলেন, সেই বালককবিকে নিয়েও তাঁর গবেষণা অচিরেই 'ভারতী'তে (আষাঢ় ১২৮৬) 'চ্যাটার্টন— বালককবি' নামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

অন্যদিকে পণ্ডিতমহলের মূল্যায়নে ফাঁক ও ফাঁকি থেকে অনুমানের অসারতা নিয়ে ভানুসিংহের পরিচয় নিয়ে যাতে রহস্য আরও ঘনীভূত না হয়, এজন্য রবীন্দ্রনাথ 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' প্রকাশের সমকালেই 'বনজীবন' (শ্রাবণ ১২৯১) পত্রিকায় সব্যঙ্গে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' লিখেছেন। এটি আবার তাঁর প্রথম ব্যঙ্গরচনাও। অন্যদিকে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর কথাতে ভর করেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভানুসিংহের কবিতায় আত্মনিয়োগ করে সফলতা পেয়েছেন, একথাও যথার্থ নয়। কৈশোরেই তাঁর মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলির প্রতি তীব্র অনুরাগ লক্ষণীয়। সেখানে বিদ্যাপতির ব্রজবুলি ভাষার প্রতি দুর্বার আকর্ষণের মূলে শুধু ভাষাগত দুর্বোধ্যতা রহস্যময়তাকেই দায়ী করলে ভুল হবে। রবীন্দ্রনাথ যদিও সেদিকেই আমাদের দৃষ্টিকে সক্রিয় করে তুলেছেন। অথচ তা হলে সেই চর্চা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারত না। রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র ভূমিকার (১৯৪০) শেষে স্পষ্ট করে বলেছেন, 'এ কথা বলে রাখি ভানুসিংহের পদাবলী ছোটো বয়স থেকে অপেক্ষাকৃত বড়ো বয়স পর্যন্ত দীর্ঘকালের সূত্রে গাঁথা।' সেক্ষেত্রে কবিখ্যাতি পাওয়ার পরেও রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহের প্রতি একাত্মতাবোধকে নিবিড় করে তুলেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র প্রথম সংস্করণের (১৮৮৪) আখ্যাপত্রে কবি নিজেকেই 'প্রকাশক' হিসেবে বিজ্ঞাপিত করেছেন। সবদিকেই ভানুসিংহের কবিতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের সযত্নে লালিত উদ্যোগের মধ্যে তাঁর নিছক প্রাচীন কবির কবিখ্যাতির লক্ষ্য যে ছিল না, অচিরেই তার পরিচয় মেলে।

আসলে বৈষ্ণব পদাবলির প্রতিই তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধাবোধ ও তীব্র আকর্ষণ তাঁর তন্বিষ্ঠ অনুসন্ধিৎসা ও নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায়ের মধ্যেই প্রতীয়মান। সেখানে বয়সোচিত জ্ঞানের অভাবে নয়, তাঁর স্বকীয় অসাধারণত্বকে সঙ্গী করেই রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহের বিস্তার ঘটেছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনকথা'য় রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি মুগ্ধতার কথা বলেও তাতে তাঁর 'কাব্যরস-উপভোগ'-এর বাইরে 'বৈষ্ণবতত্ত্ব বোঝবার বয়স ও আগ্রহ তখনো হয়নি' বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। অথচ সেই রবীন্দ্রনাথই ক্রমশ সেই বৈষ্ণবতত্ত্বে সুদক্ষ হয়ে উঠেছিলেন বলেই প্রভাতকুমারই তার অব্যবহিত পরের বাক্যেই বলেছেন, 'তাঁর অসংখ্য কবিতায় বৈষ্ণবীয় ভাব ও ভাষা এমনভাবে মিশে আছে যে, লোকে ভুল করে ভাবতেও পারে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ অর্থে বুঝি বৈষ্ণব ছিলেন।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভানুসিংহের 'সজনি গো,/শাঙনগগনে ঘোর ঘনঘটা, 'বার বার সখি, বারণ করনু,/না যাও মথুরাধাম' বা 'মরণ রে/তুঁহু মম শ্যামসমান' প্রভৃতি পদে সেই ভাবের বিস্তার রবীন্দ্রনাথকেও বৈষ্ণব কবি মনে হয়। শুধু তাই নয়, পদগুলির মধ্যে সুরের ব্যঞ্জনায়, গানের অস্তিত্বে অভিনব আবেদন বয়ে আনার প্রতি সুকুমার সেন সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'-এ (চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স) তিনি আরও জানিয়েছেন, 'এই গানগুলির দ্বারাই রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম জনসাধারণের কাছে পরিচিত হইয়াছিলেন। অন্যদিকে বৈষ্ণব পদাবলী গভীরভাবে আত্মস্থ করেছিলেন বলেই তো রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহের মাধ্যমে নিজেকে বিস্তার করতে পেরেছিলেন। 'জীবনস্মৃতি'তেও তাঁর সত্যান্বেষণী মনের কথা নিজেই ব্যক্ত করেছেন তিনি, 'গাছের বীজের মধ্যে যে-অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নীচে যে রহস্য অনাবিষ্কৃত, তাহার প্রতি যেমন যেমন একটি একান্ত কৌতূহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি যে বিদ্যাপতি বা তাঁর ব্রজবুলি ভাষার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, অন্যান্য পদকর্তাদের পদেও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছিল, তা সহজেই অনুমেয়। ভানুসিংহের ভাষায় বিদ্যাপতি বা ব্রজবুলি প্রকট হয়ে উঠলেও ভাবে চণ্ডীদাসের প্রভাবও সেখানে বর্তমান। 'মরণ রে/তুঁহু মম শ্যামসমান' রাধাবিরহের জনপ্রিয় চণ্ডীদাসের ছায়া সুস্পষ্ট।

অন্যদিকে শুধু ভানুসিংহের কবিতাতেই নয়, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের মধ্যেও তাঁর বৈষ্ণব পদাবলি সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধিৎসা বেরিয়ে এসেছে। 'আলোচনা'র (১৮৮৫) 'বৈষ্ণব কবির গান', 'সমালোচনা'র (১৮৮৮) 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি', 'বসন্তরায়' প্রভৃতি প্রবন্ধে তার পরিচয় বর্তমান। 'বৈষ্ণব কবিতার গান'-এ রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের আধারে স্বর্গের পরিচয়কে নিবিড় করে তুলে ধরেছেন। সেখানে জ্ঞানদাসের গানের উদ্ধৃতিতে তা মূর্ত করে তুলেছেন। আবার 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কবিত্বের পার্থক্যই শুধু স্পষ্ট করে তোলেননি, দ্বিতীয়জনের চেয়েও প্রথমজনের কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বকে বিশদে আলোচনা করেছেন। 'বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডিদাস দুঃখের কবি'র মূল্যায়ন বাঙ্গলায় বৈষ্ণব পদাবলীর আলোচনায় পথনির্দেশ হয়ে উঠেছে।

শুধু তাই নয়, 'বসন্তরায়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি ও বসন্তরায়ের মধ্যে পার্থক্য রচনা করে বসন্তরায়ের ব্রজবুলি ভাষা ও তাঁর কবিত্বের সুখ্যাতি করেছেন। প্রবন্ধের বইদুটিকে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীতে অগ্রাহ্য করলেও বৈষ্ণব পদাবলির আলোচনায় সেগুলি অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মননে বৈষ্ণব পদাবলি সুদীর্ঘকাল সক্রিয় ছিল। সময়ান্তরে তিনি তাতে মনোযোগীও হয়েছেন। 'আধুনিক সাহিত্য' (১৯০৭)-এর 'বিদ্যাপতির রাধিকা'র মধ্যে তার পরিচয় মেলে। সেটি 'সাধনা' পত্রিকায় ১২৯৮-এর চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তার মধ্যেও চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির রাধার তুলনামূলক আলোচনা বর্তমান। শুধু তাই নয়, সেখানে বিদ্যাপতির রাধার চিরনবীন প্রেমের ভূমিকার পরে চণ্ডীদাসের চিরপুরাতন প্রেমের কথা আন্তরিক ভাবে ফুটে উঠেছে।

বিদ্যাপতির অপূর্ণতার আধারেই চণ্ডীদাসের প্রেমের অপার মহিমা বিস্তার লাভ করে। সেক্ষেত্রে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেমের অসীম ব্যঞ্জনায় বিমুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র ভানুসিংহের পদাবলী বা প্রবন্ধাদিতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেই ক্ষান্ত হননি, কবিতাতেও সক্রিয় হয়েছেন। বৈষ্ণবতত্ত্বকথাকে তাঁর মতো এমন সহজ করে ইতিপূর্বে আর কেউ বলেননি। পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলনসাধনের কথা কত ভাবেই না ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। সেখানে প্রেমের বিস্তারে বৈষ্ণব পদাবলির আবেদন সহজেই অবৈষ্ণবদের মনেও সৌরভ ছড়িয়ে দেয়।

'সোনার তরী' (১৮৯৪) কাব্যের 'বৈষ্ণবকবিতা'য় সেই প্রেমের কথাই প্রথমে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবদের গান' বলে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন কবি। সেখানে রাধার প্রেমের একাত্মতায় কবিদের বিস্ময়কর সৃষ্টির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ চিরন্তন প্রেমের কথাই স্মরণ করেছেন। কবির ভাষায় : 'সত্য করে কহো মোরে হে বৈষ্ণব কবি,/কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,/কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান/বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান,/রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে?' সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই দেবতা ও প্রিয় একাকার হয়ে ওঠে। কবির ভাষায় : 'দেবতারে যাহা দিতে পারি, দেই তাই/প্রিয়জনে--- প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই/তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা!/দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।' রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলির কবিত্বের প্রতি তীব্র অনুরাগী হয়েই শুধু ভানুসিংহ হয়ে ওঠেননি, তার সঙ্গে বৈষ্ণবতত্ত্বের যোগও নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ছিল। গাছের উপরের ফুলফলের দৃষ্টি থেকে মাটির মূলের অন্তর্দৃষ্টি তাঁর আপনাতেই প্রসারিত হয়েছিল। এজন্য অবৈষ্ণব হয়েও তিনি যেভাবে ভানুসিংহ ঠাকুরের মধ্যে আত্মগোপন থেকে আত্মপ্রকাশ করে ক্রমশ তাঁর আত্মস্থ প্রকৃতিকে সাহিত্যের নানা শাখাপ্রশাখায় সবুজ করে তুলেছেন, তা তাঁর দিগন্তবিস্তারী সৃষ্টিশীলতারই পরিচয়বাহী। অন্যদিকে বৈষ্ণব পদাবলিকে আধুনিক পরিসরে তিনি শুধু পুনর্জন্মই দেননি, তার বনেদিয়ানাকেও নতুন করে প্রাণিত করেছেন। সেক্ষেত্রে বৈষ্ণব পদাবলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কই অনন্য ইতিহাস রচনা করেছে, যা নীরবে নিভৃতে আমাদের পথ দেখিয়ে চলে অবিরত, বিস্ময় জাগিয়ে রাখে নিরন্তর।

(২২শে শ্রাবণ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

(লেখক, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া)

পাত্রী চাই

কলকাতা মানিকতলা নিবাসী ডাক্তার পাত্রের জন্য কলকাতা অথবা পার্শ্ববর্তী জেলা নিবাসী, পশ্চিমবঙ্গীয় বনেদি পরিবারের ২৫ অনূর্ধ্বা, শিক্ষিতা, ৫'৫", সুশ্রী, সুপাত্রী চাই। ডাক্তার পাত্রী অগ্রগণ্যা। দেবারি কিংবা দেবগণ কাম্য।

যোগাযোগ : ৮৭৭৭৮১৬৪০০

শিশুমন্দিরের মুকুটে যুক্ত আরেকটি পালক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২৭ জুলাই কলকাতায় নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত অষ্টম আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় হাওড়া জেলার তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশুমন্দির (মাধ্যমিক বিভাগ)-এর অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী ঐন্দ্রিলা ঘোষ স্বর্ণপদক লাভ করেছে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় তার এই সাফল্য ও পদক জয় শিশুমন্দিরের মুকুটে আরেকটি পালক যোগ করলো। ঐন্দ্রিলার সাফল্যে শিশুমন্দির পরিবারের সকলেই গর্বিত বোধ করেছেন। সবাই ঐন্দ্রিলার উত্তরোত্তর সাফল্য প্রার্থনা করেছেন।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে গঙ্গাসাগরে ভয়াবহ ধস

যেকোনো মুহূর্তে তলিয়ে যেতে পারে কপিলমুনির মন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পূর্ণিমার ভরা কোটাল, নিম্নচাপ ও প্রবল জলোচ্ছ্বাসের ত্র্যহস্পর্শে গঙ্গাসাগর তীরবর্তী এলাকায় ভয়াবহ ধসের ফলে বিপর্যস্ত কপিলমুনির মন্দির। এই ঘটনার জেরে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। গত ২১ জুলাই পূর্ণিমার কোটাল ও নিম্নচাপের প্রভাবে ধস নামে কপিলমুনির মন্দির সংলগ্ন সাগরতীরে। এই ধসের ফলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে সাগরতটের ১ নম্বর থেকে ৫ নম্বর স্নানঘাট। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে পূর্তবিভাগ নির্মিত ১০ ফুটের চওড়া কংক্রিটের রাস্তা সমুদ্রের তলায় তলিয়ে গিয়েছে।

শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে '২ নম্বর রাস্তা' বলে পরিচিত ৩০ থেকে ৪০ ফুটের রাস্তাটি তলিয়ে গিয়েছে সমুদ্রগর্ভে। শুধু রাস্তাই নয় বিপর্যস্ত হয়ে পরেছে একাধিক লাইটপোস্ট এবং ট্রান্সফর্মার। ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে একাধিক পানীয় জলের পাইপ এবং ট্যাপকল। এছারাও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বিদ্যুৎ সংযোগ। ওই এলাকা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ দপ্তর। বিপদের আশঙ্কায় সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে অস্থায়ী দোকান-পাটগুলিকেও।

সাগর তীরবর্তী এলাকাগুলিতে বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা করা হয় যাতে কোনো পুণ্যার্থী সাগরের জলে স্নান করতে না নামেন। এই ধস এবং ভাঙন নিয়ে ইতিমধ্যে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে স্থানীয় মানুষের। পাশাপাশি উদ্বিগ্ন স্থানীয় প্রশাসন। সাগরের বিডিও কানাই কুমার রায় জানিয়েছেন, ৪ নম্বর রাস্তায় বেশ বড়সড় ভাঙন ধরেছে।

বিষয়টি ইতিমধ্যেই সেচ দপ্তর এবং পূর্ত দপ্তরকে জানানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য দাবি করে স্থানীয় পঞ্চায়েত উপপ্রধান হরিপদ মণ্ডল জানিয়েছেন যে সামনে সমূহ বিপদ। এই ভাঙনের জেরে যে কোনো মুহূর্তে তলিয়ে যেতে পারে কপিলমুনির মন্দির। অতীতে কপিলমুনির তিনটি আশ্রম সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

শিবাজী মহারাজের বাঘনখ ফিরে এল ভারতে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ১৬৫৯ সালে যে বাঘ নখ দিয়ে ছত্রপতি শিবাজী মুঘল সেনাপতি আফজল খানের জীবন নিয়ে তাঁর বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন, সেই বাঘনখ অস্ত্র এখন থেকে দেশের মানুষ দেখতে পাবেন। মহারাষ্ট্রের একনাথ শিণ্ডে সরকারের সমস্ত প্রচেষ্টার পর শিবাজী মহারাজ ব্যবহৃত 'বাঘনখ' নামক এই অস্ত্রটি লন্ডন মিউজিয়াম থেকে এনে মহারাষ্ট্রের সাতারা মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে। জানা গিয়েছে যে রাজ্যে প্রদর্শনের জন্য লন্ডনের ভিক্টোরিয়া ও অ্যালবার্ট মিউজিয়াম থেকে তিন বছরের জন্য আনা হয়েছে এই অস্ত্রটি। গত ২৪ জুলাই লন্ডনের যাদুঘর থেকে মুম্বইয়ে পৌঁছায় এই বাঘনখ।

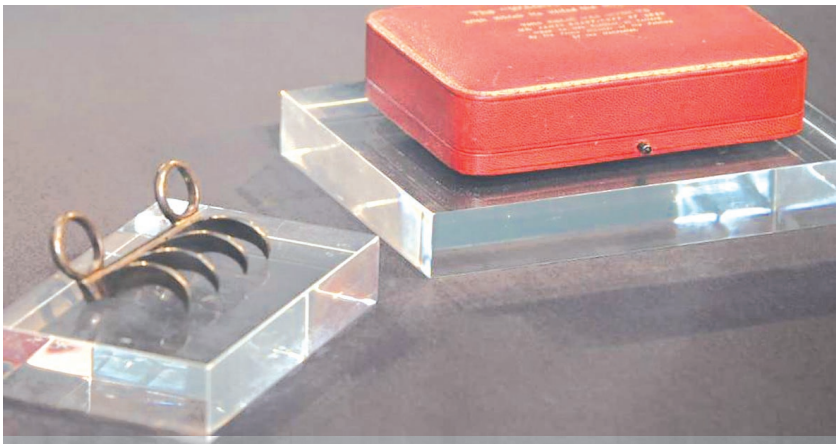

গত ২৭ জুলাই সাতারার ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ যাদুঘরে প্রধান আকর্ষণ হিসেবে বাঘনখের সঙ্গে মরাঠা যোদ্ধাদের সময় থেকে আনা অস্ত্র-সহ শিবশাস্ত্র শৌর্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিণ্ডে। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ ও অজিত পাওয়ার। মিউজিয়ামের গ্যালারিতে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার কোনো ওঠানামা না করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটি একটি চামড়ার কেসের মধ্যে রাখা হয়েছে। এই বিশেষ অস্ত্রকে ঘিরে রয়েছে সুইডেনে তৈরি একটি শক্ত কাঁচের ঘর। এই অস্ত্র সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য দিয়ে একটি পাঠ্যের সঙ্গে সাজিয়ে রাখা হয়েছে বাঘনখ। ওই পাঠ্যে বলা হয়েছে যে অস্ত্রটি ১৮১৮ সালে পেশোয়া শাসনের পতনের পরে সাতারার আদালতের রাজনৈতিক এজেন্ট জেমস গ্রান্ট ডাফকে সাতারার রাজপরিবার উপহার দিয়েছিল। শিবাজীর বীরত্বের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে এই বিশেষ অস্ত্র ভারতের ঐতিহ্যে নতুন মাইলফলক যোগ করলেও এটিকে ভুল বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন ঐতিহাসিকদের একাংশ। এই বামপন্থী ইতিহাসবিদদের বক্তব্য হলো— এই বিশেষ বাঘ নখটি ১৬৫৯ সালে সাতারা জেলার প্রতাপগড় দুর্গে আফজল খানকে হত্যা করার জন্য শিবাজী মহারাজ ব্যবহার করেছিলেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। কোলাপুর নিবাসী ইতিহাসবিদ ইন্দ্রজিৎ সাওয়ান্ত বাঘনখের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দাবি করেছেন যে আসলটি এখনও সাতারার রাজপরিবারের কাছে রয়েছে।

এর প্রতিক্রিয়ায় কড়া ভাষায় মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে কিছু লোক এই বাঘনখ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছেন। তাঁরা শিবাজী মহারাজ প্রদর্শিত বীরত্বকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছেন। ছত্রপতির অনুগামীরা এটা কখনই সহ্য করবে না। এই বিকর্ত প্রসঙ্গে শিবাজী মহারাজের ১৩তম বংশধর তথা সাতারার বিজেপি সাংসদ উদয়নরাজে ভোঁসলে বলেছেন যে মরাঠা যোদ্ধাদের ঘিরে এই বিতর্ক তৈরি করা উচিত নয়।

আমন্ত্রণ জানানোর পরেও এই অনুষ্ঠান এড়িয়ে যাওয়ার জন্য একনাথ শিণ্ডে বিরোধী জোট মহাবিকাশ আঘাড়ি নেতাদের উদ্দেশে বলেছিলেন যে এই বিরোধী দলগুলি সবসময় ভালো কাজ বয়কট করে এসেছে। প্রসঙ্গত, সাতারা জেলার ঐতিহাসিক প্রতাপগড় দুর্গের সংরক্ষণের কাজগুলি পরিচালনা করার জন্য 'প্রতাপগড় কর্তৃপক্ষ' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেছিলেন শিণ্ডে। এই কাজগুলি দেখাশোনা করবেন উদয়নরাজে ভোঁসলে। এই কাজের জন্য ১৫০ কোটি টাকা তহবিলও বরাদ্দ করেছে মহারাষ্ট্র সরকার। সাতারা জেলার সঙ্গম মাহুলিতে, কোলাপুরের (পূর্বতন করভীর) প্রতিষ্ঠাতা তারারানি মহারানির স্মৃতিসৌধও পুনরুদ্ধার করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

শোক সংবাদ

সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের কার্যালয় প্রমুখ সুমিত কুমার মল্লিক গত ২৯ জুলাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে

বাগুইআটির বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী (অঞ্জনা মল্লিক, উত্তর কলকাতা জেলার অন্যতম সহ সভানেত্রী) এবং একমাত্র পুত্র রেখে গেছেন।

পুরীর রথযাত্রায় স্বয়ংসেবকদের সেবাকাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ যে কোনো ঘটনা, দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অতি পরিচিত একটি দৃশ্য। গত ৭ ও ৮ জুলাই পুরীতে

আয়োজিত রথযাত্রায় উৎকল বিপন্ন সহায়তা সমিতি ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তরফে নিরন্তর সেবাকাজের অভূতপূর্ব নিদর্শন। ১৫০০-এর বেশি কার্যকর্তা এই দিনগুলিতে পুরীতে সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। রথযাত্রায় প্রবল ভিড়ে আহত এবং নানা কারণে অসুস্থ হয়ে পড়া পুণ্যার্থীদের হাসপাতালে পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া—সবকিছুতেই স্বয়ংসেবকরা বাড়িয়ে দেন সাহায্যের হাত। ঘটনাস্থল থেকে হাসপাতাল পর্যন্ত অ্যাম্বুলেন্স চলাচলের রাস্তা ভিড়মুক্ত রাখতেও সচেষ্ট ছিলেন স্বয়ংসেবকরা। উৎকল বিপন্ন সহায়তা সমিতি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, যেখানে রথযাত্রা সংঘটিত হয়, সেই ঘটনাস্থলে আহত ও অসুস্থ পুণ্যার্থীদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ৮ জন ডাক্তার, ২ জন ফার্মাসিস্ট ও ২ জন স্বাস্থ্য সহায়ক কর্তব্যরত ছিলেন। অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ৪০ জন কার্যকর্তা। নয়টি স্ট্রেচারে করে অসুস্থদের বহন করার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন ৩৬ জন স্বয়ংসেবক। রথযাত্রার স্থানে সাধারণ মানুষকে পানীয় জল সরবরাহ করার কাজে যুক্ত ছিলেন ৬০ জন স্বয়ংসেবক। প্রচণ্ড গরমে পুণ্যার্থীদের ওপর জলসিঞ্চনের জন্য ১৪টি যন্ত্র বসানো হয়েছিল। ৪২ জন স্বয়ংসেবক সেই কাজে যুক্ত ছিলেন।

পুরীর স্থানীয় হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে আহত-অসুস্থ পুণ্যার্থীদের দেখভাল ও পরিচর্যায় ৩৫০ জন স্বয়ংসেবক যুক্ত ছিলেন। এছাড়াও সাফাইয়ের কাজে ১০টি দলে ১৫০ জন স্বয়ংসেবক সেবাদান করেন। রথযাত্রায় আগত পুণ্যার্থীদের খাবার বিতরণের কাজে ৬০ জন স্বয়ংসেবক যুক্ত ছিলেন। প্রতিটি রাস্তায় মানবশৃঙ্খল তৈরি করে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা সচল রাখতে নিযুক্ত ছিলেন ১০৬০ জন স্বয়ংসেবক। রথযাত্রা চলাকালীন দু'দিন ধরে সব স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তারা লাগাতার তাদের এই সেবাকাজ চালিয়ে যান। রথযাত্রা চলাকালীন ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে সেবাকাজ পরিচালনা করেন— রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ওড়িশা (পূর্ব) প্রান্ত সঙ্ঘচালক সমীর মোহান্তি, প্রান্ত প্রচারক বিপিন প্রসাদ নন্দ, সহ-প্রান্ত কার্যবাহ সুদর্শন দাস, প্রান্ত সেবাপ্রমুখ শান্তনু মাঝি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সম্পর্ক প্রমুখ বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়, সেবা ভারতীর অখিল ভারতীয় সংগঠন মন্ত্রী সুধীর জী, উৎকল বিপন্ন সহায়তা সমিতির সভাপতি অক্ষয় বিট, সেবা ভারতীর প্রান্ত সংগঠন মন্ত্রী কৈলাস চন্দ্র জেনা, রথযাত্রা সেবার সংযোজক রুদ্র নারায়ণ মহাপাত্র।

প্যারিস ওলিম্পিকে শ্যুটিঙে পদক এল ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২৮ জুলাই প্যারিস ওলিম্পিকে মেয়েদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পদক জয় করেন ২২ বছর বয়সি হরিয়ানা নিবাসী শ্যুটার মনু ভাকর। দীর্ঘ ১২ বছর পর ওলিম্পিকে শ্যুটিঙে পদক পায় ভারত। এই ওলিম্পিকে এটি ভারতের প্রথম প্রাপ্ত পদক গত ২৮ জুলাই মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল শ্যুটিঙে এক চুলের জন্য রুপোর পদক পাননি মনু। ০.০১ পয়েন্টের জন্য রুপো হাতছাড়া হয় তাঁর। ২২১.৭ পয়েন্ট নিয়ে ফাইনালে ব্রোঞ্জ পান তিনি। ২৪৩.২ পয়েন্ট পেয়ে এই ইভেন্টে সোনা জেতেন দক্ষিণ কোরিয়ার ও ইয়ে জিন। ২৪১.৩ পয়েন্ট পেয়ে রুপো জেতেন দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়েজি কিম। মনুর কোচ হলেন যশপাল রানা। ২০১৮ সালে আইএসএসএফ বিশ্বকাপে মনু ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে দুটি স্বর্ণপদক জয় করেছিলেন। সেই বিশ্বকাপে তিনি সর্বকনিষ্ঠ স্বর্ণপদক জয়ী ভারতীয় ছিলেন। ২০১৮ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে কমনওয়েলথ গেমসে

অংশগ্রহণ করে মেয়েদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে স্বর্ণপদক জয় করেন। ২০২০ সালে টোকিয়ো ওলিম্পিকে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই বছর প্যারিস ওলিম্পিকের দ্বিতীয় দিনে তিনি তাঁর প্রথম ব্রোঞ্জ পদকটি জয় করেন। গত ৩০ জুলাই, ওলিম্পিকের চতুর্থ দিনে ১০ মিটার এয়ার পিস্তল মিক্সড টিম ইভেন্টে মনু ভাকর ও সরবজোত সিংহ ব্রোঞ্জ পদক জয় করেন। এটি ভারতের প্রাপ্ত দ্বিতীয় ওলিম্পিক পদক স্বাধীনতার পর মনু ভাকর হলেন প্রথম ভারতীয় ক্রীড়াবিদ যিনি ওলিম্পিকে দুটি পদক জয় করলেন। ১৩ রাউন্ডের লড়াইতে দক্ষিণ কোরীয় জুটি লি উয়োনোহো-ও ইয়ে জিনকে ১৬-১০ পয়েন্টের ব্যবধানে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জয় করে ভারতীয় জুটি। গত ২৭ জুলাই, পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে ৫৭৭ পয়েন্ট পেয়ে নবম স্থান অধিকার করে ফাইনালে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছিলেন আম্বালা-নিবাসী শ্যুটার সরবজোত। কিন্তু ভেঙে পড়েননি। মনু ভাকরের সঙ্গে জুটি বেঁধে পদক জয়ের পর উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে পারেননি।